[Approved by the Calcutta Central Text Book Committee.]

শিক্ষাসার।

অর্থাৎ

এতদ্দেশীয় বালক-বালিকাগণের শিক্ষার উপযোগী

নীতিগ্রন্থ।

পঞ্চম সংস্করণ।

শ্রীতারাকুমার কবিরত্ন-প্রণীত।

CALCUTTA:
B. K. CHAKRAVARTI & BROTHERS.
25, PATALDANGA STREET

1906

মূল্য ।৵০ ছয় আনা।

ভূমিকা।

অনুসন্ধান করিলে ভারতের জ্ঞান-ভাণ্ডারে শিক্ষার উপযোগী সকল নীতি প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং ঐ সকল নীতি মাতৃস্তন্যের ন্যায় আমাদের জীবনের উপাদান। নীতিমাত্রই বিশ্বজনীন। কিন্তু দেশভেদে লোকের আচার ব্যবহার ও কার্য্যপ্রণালী প্রভৃতি বিভিন্ন হওয়ায়, একই নীতি বিভিন্ন আকারে প্রতীয়মান হয়। যে নীতি যে দেশে যে আকারে প্রস্ফুটিত হয়, তাহা সেই দেশে সেই আকারে যেমন মধুর ও হৃদয়গ্রাহী হইয়া থাকে, অন্য কোনও আকারে তেমন হয় না। তাই স্বদেশীয় আকারে কয়েকটী নীতি প্রদর্শন করিলাম। আবার স্বদেশে কোন বিষয়ের অভাব থাকিলে তাহা পরদেশ হইতে আনিয়া ভাঙ্গিয়া চূরিয়া দেশীয় ছাঁচে গড়িয়া লইতে হয়। কিন্তু আমার এই গ্রন্থখানির জন্য সেরূপ করিবার প্রয়োজন হয় নাই, মনোমত উপাদান স্বদেশেই পাইয়াছি।

সদ্ভাবময়ী সীতা, প্রজাপ্রাণা বাক্‌পুষ্টা, কুলপাবন বাণভট্ট, ধর্ম্মবীর যুধিষ্ঠির, দয়াবীর জীমূতবাহন, পুণ্যশ্লোক অবন্তিবর্ম্মা, অনুতাপদগ্ধ রত্নাকর, বিশ্বপ্রেমিক নারদ, এ সকল চরিত্র বাস্তবিক দুর্লভ। কর্ণ, অভিমন্যু লব, কুশ, চন্দ্রকেতু প্রভৃতি বালকের চরিত্রও অমূল্য। ভারতে প্রকৃত জ্ঞান ও ধর্ম্মের পুনরুদ্দীপনা করিতে হইলে, বহুল পরিমাণে এই সকল চরিত্রেরই আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত। আমি এই বিবেচনা করিয়া, এই সকল দেশীয় উপাদানেই এই শিক্ষাসার প্রস্তুত করিলাম। রামায়ণ, মহাভারত, মনুসংহিতা, রঘুবংশ, উত্তরচরিত, শ্রীহর্ষচরিত, কাদম্বরী, নাগানন্দ, রাজতরঙ্গিণী প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে বিবিধ নীতি সংগ্রহ করিয়া যথাস্থানে নিবেশিত করিয়াছি।

সিটি কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ ধীরবর শ্রীযুত উমেশচন্দ্র দত্ত, এবং বিখ্যাত সমালোচক সুপণ্ডিত শ্রীযুত চন্দ্রনাথ বসু, এই দুই বন্ধুবরের নিকট আমি এ বিষয়ে যথেষ্ট উপকার লাভ করিয়াছি ; এজন্য তাঁহাদের নিকট চিরজীবন ঋণী রহিলাম।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতাবলী হইতে 'স্বদেশ' এবং কাশীরাম দাসের মহাভারত হইতে 'অভিমন্যু' গ্রহণ করিলাম। গ্রহণকালে আবশ্যকমত পরিবর্জ্জন ও পরিবর্ত্তন করিয়াছি। শ্রীযুত উমেশ বাবু ইহাতে সংক্ষিপ্ত সীতাচরিত্র সন্নিবেশ করিতে বলেন, আমি তাঁহার ইচ্ছায় সেই বিশ্বমোহন চরিত্রের সারমাত্র ইহাতে প্রদান করিলাম ; সেই সদ্ভাবময়ীর চরিত্র যে জগতের নরনারীমাত্রেরই আদর্শ, তাহাই ইহাতে প্রকাশ করিলাম।

সচরাচর বাঙ্গালা পাঠ্য পুস্তক হয় কেবল গদ্যে না হয় কেবল পদ্যে রচিত হইয়া থাকে ; সুতরাং গদ্য ও পদ্য পড়িবার জন্য প্রত্যেক ছাত্রকে দুইখানি পুস্তক ক্রয় করিতে হয়। আবার ঐ সকল পুস্তকের কলেবর এত বৃহৎ যে, ছাত্রেরা সংবৎসরে তাহার অর্দ্ধেকও শেষ করিতে পারে না। এই অসুবিধা দেখিয়া আমি ইহাতে যথাক্রমে গদ্য ও পদ্য সন্নিবেশিত করিয়াছি, এবং যাহাতে সংবৎসরে সমগ্র পুস্তক আয়ত্ত হইতে পারে, ইহার কলেবরও তদনুরূপ করিয়াছি।

কলিকাতা।
১০ই ফাল্গুন। ১২৯২ সাল।

শ্রীতারাকুমার শর্ম্মা।

তৃতীয়বারের বিজ্ঞাপন।

এই সংস্করণে স্থানে স্থানে কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হইল।

শ্রীতারাকুমার শর্ম্মা।

২০শে পৌষ, ১৩০৬ সাল।

সূচীপত্র ।

শিক্ষাসার।

স্তোত্র।

ঈশ্বর।

নিকুঞ্জভবনে কুসুমিত বনে
পিককুল-কলরবে,
তরুর ছায়ায় লতায় পাতায়
তব প্রেম হেরি সবে।
জননীর স্তনে দয়ালুর মনে
অরুণ ভানুর করে,
উষার সমীরে নির্ঝরে শিশিরে
তবে প্রেম সদা ঝরে।
ভূধরে কন্দরে প্রান্তরে সাগরে
যথা যাই তথা হেরি,
গগনে কি বনে অখিল ভুবনে
তব ছবি আহা মরি!

তুমি দয়াময় প্রেমের নিলয়
বিশ্বের আশ্রয়ভূমি,
পাতকিতারণ তাপনিবারণ
জীবের শরণ তুমি।
তোমারি নিদেশ পাইয়া দিনেশ
ত্রিভুবন আলো করে,
তব আজ্ঞাকর নিত্য সুধাকর
সকলের তাপ হরে।
কলনিনাদিনী যত কল্লোলিনী
ঘুষিছে তোমার যশ,
ক্ষরে মহৌষধি তব নিরবধি
অবারিত কৃপারস।
তব আজ্ঞাবলে জলধির তলে
কতই রতন জ্বলে,
জলধারা ঘন করে বরষণ
শোভে ধরা শস্য-ফলে।
জ্বলিছে জ্বলন বহিছে পবন
শাসনে বিভু! তোমার,
হে ভয়ভঞ্জন! নিত্য নিরঞ্জন!
তুমি ভব-কর্ণধার।

গুরু-শিষ্য-সংবাদ।

বারাণসীনগরে বেদব্রতনামে এক উপাধ্যায় মঠে ছাত্রগণকে শিক্ষাদান করিয়া থাকেন। একদা তিনি ছাত্রবৃন্দে পরিবৃত আছেন, এমন সময় জীবনানন্দ নামে একটী দীনবেশ বালক তাঁহার চরণসমীপে উপস্থিত হইল।

জীব। (প্রণত হইয়া) ভগবন্! প্রণাম করি।

উপা। চিরজীবী হও, এস এস, এইখানে বোস। বৎস! তুমি বড়ই প্রিয়দর্শন, কে তুমি? কোথা হইতে কি জন্যই বা এখানে এসেছ?

জীব। আমি দীনহীন বালক, বিদ্যাশিক্ষার জন্য আপনার সেবা করিব বলিয়া বঙ্গদেশ হইতে আপনার পদতলে আসিয়াছি।

উপা। বৎস! তোমার নাম কি? তোমার মা আছেন? বাপ আছেন ত? তোমার কথাগুলি যেন অমৃতবিন্দুর ন্যায় মধুর, তোমাকে দেখিয়া স্নেহে আমার হৃদয় আর্দ্র হইতেছে, অতএব তোমার আত্মবৃত্তান্ত বল।

জীব। ভগবন্! আমার দরিদ্র পিতার আমি একমাত্র জীবনসর্বস্ব পুত্র ছিলাম। তিনি আমার 'জীবনানন্দ' এই নাম রাখিয়াছিলেন। আমাকে স্তন্যপায়ী শিশু রাখিয়া মা পরলোক গমন করেন। পুত্রস্নেহবশতঃ পিতা অতি কষ্টে

সেই শোক সংবরণ করিয়া একাকী আমায়ই প্রতিপালনে নিযুক্ত হইলেন।

উপা। বৎস! তার পর তার পর?

জীব। এখন আমার তের বৎসর বয়সে পিতাও পরলোকে গিয়াছেন। আমি নিরাশ্রয় হইয়াছি। (ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক স্বর্গগত পিতাকে উদ্দেশ করিয়া) হা পিতঃ! হা পুত্রময়-জীবিত? আজি তোমা বিনা আমার জীবন শূন্য হইয়াছে।

উপা। অহহ! এই সকল সাংসারিক দুর্ঘটনা নিতান্তই মর্ম্মভেদী। বৎস! আশ্বস্ত হও আশ্বস্ত হও, দুঃখ করিও না, ঈশ্বরই অশরণের শরণ। সেই করুণাময় পিতৃহীনের পিতা, মাতৃহীনের মাতা, বন্ধুহীনের বন্ধু, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়। বৎস! তাঁহাকেই সর্ব্বান্তঃকরণে আশ্রয় কর। সেই দীননাথ বিনা আর কে দীনজনের সহায় আছেন?

জীব। উঃ! মনে পড়িতেছে আমার মনে পড়িতেছে! পিতাও মৃত্যুকালে আমায় এই উপদেশ দিয়াছিলেন।

উপা। বৎস! তোমার পিতা মৃত্যুকালে কি উপদেশ দিয়াছিলেন?

জীব। (সজলনয়নে) আমি পিতার মৃত্যুকাল উপস্থিত দেখিয়া যখন তাঁহার চরণ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলাম, তখন পিতা সেই অবস্থায়ও অতি কষ্টে উঠিয়া বসিলেন, এবং আমাকে বুকের ভিতর লইয়া কপোলে কপোল সংলগ্ন করত ক্ষণকাল চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

উপা। অহো! অপত্যস্নেহের কি প্রভাব! ইহার আকর্ষণে মুমূর্ষু ব্যক্তিও ক্ষণকাল মৃত্যুযন্ত্রণা বিস্মৃত হয়। বৎস! তার পর তার পর?

জীব। তার পর স্থিরনেত্রে আমায় অনেক ক্ষণ ধরিয়া দেখিলেন। অনন্তর, ক্ষীণ স্বরে যেন কত কষ্টেই বলিলেন,—"বৎস! তুমি যে পিতৃগতপ্রাণ তাহা আমি জানি। স্নেহের এমনি আকর্ষণ যে, সুধীর ব্যক্তিরও চিত্তকে আকুলিত করে। এ বিপদও এড়াইবার নহে। বৎস! কাতর হইও না। বাবা! তোমার এই মনোদুঃখে আমার যে কষ্ট হইতেছে, এ মৃত্যু-যন্ত্রণাও তত কষ্টের নহে। ধৈর্য্য ধারণ কর। জগতে ঈশ্বরই প্রকৃত বন্ধু, পিতা মাতা কয় দিনের জন্য? উঠ বৎস! এ সময়ে যাহা কর্ত্তব্য তাহা কর। সর্ব্বদা যেন তোমার ঈশ্বরে ভক্তি থাকে।

ঈশ্বরে সদাই যার দৃঢ় ভক্তি রয়,
কি ভয় কি ভয় তার কি ভয় কি ভয়?
যে দেব অনন্তকোটী জীবের আশ্রয়,
কভু কি তাঁহার ভক্ত নিরাশ্রয় হয়?

এই কথা বলিতে বলিতেই পিতা আমার চিরকালের মত নয়নযুগল মুদ্রিত করিলেন।

জীবনানন্দ এই কথা বলিতে বলিতে, হরিশ্চন্দ্র নামে একটী ছাত্র কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার সম্মুখে আসিল। "হায়! আমি অতি পাপিষ্ঠ! আমি কি দুষ্কর্ম্মই করিয়াছি! ভ্রাতঃ! আমার

অপরাধ ক্ষমা কর,” সে এই বলিয়া জীবনানন্দের কণ্ঠ আলিঙ্গন করিল, এবং অবিরল অশ্রুধারায় তাহার বক্ষঃস্থল অভিষিক্ত করত রোদন করিতে লাগিল।

উপা। বৎস! হরিশ্চন্দ্র! এ কি? কি হইয়াছে? কিজন্য এরূপ রোদন করিতেছ?

হরি। পিতঃ! আমার অপরাধ ক্ষমা করুন আমি দুষ্কার্য্য করিয়াছি। এখন অনুতাপে দগ্ধ হইতেছি।

উপা। কেন বৎস! তুমি কি করিয়াছ?

হরি। এই জীবনানন্দ এই মঠের অনুসন্ধান করিতে করিতে পথে আমায় দেখিতে পাইয়া বলিল,—“ভ্রাতঃ! আমি বিদেশ হইতে আসিতেছি,—ভগবান্ (গুরুদেবের নাম করিয়া) কোন স্থানে ছাত্রগণকে অধ্যয়ন করাইতেছেন”? আমি ইহার নিতান্ত হীন বেশ দেখিয়া অবজ্ঞা করিয়া বলিলাম,—আঃ! কে রে তুই ভিখারীর ছেলে! আমাদের গুরুদেবকে খুঁজিতেছিস্? আমি এই কথা বলিয়া, ইহার অতি কাতর বাক্যেও আর কর্ণপাত না করিয়াই এখানে চলিয়া আসিলাম। এখন আমি ইহার শোকের কথা শুনিয়া এবং ইহার প্রতি আমার দুর্ব্যবহারের কথা ভাবিয়া শোকে ও অনুতাপে দগ্ধ হইয়া ইহার শরণাপন্ন হইয়াছি।

উপা। বৎস হরিশ্চন্দ্র! তুমি না বুঝিয়া অতি নিষ্ঠুর কার্য্য করিয়াছ, কিন্তু তুমি ক্ষমার পাত্র, কেননা অনুতাপে দগ্ধ হইতেছ। যখন তুমি আপনা আপনি অনুতপ্ত হইয়াছ,

তখন আর এ বিষয়ে তোমায় কোন উপদেশ দিতে হইবে না, তথাপি কিছু বলি শুন।

হরি। (কৃতাঞ্জলি হইয়া আনতমস্তকে) পিতঃ! আজ্ঞা করুন।

উপা। দয়াই সকল ধর্ম্মের মূল। দয়া না থাকিলে সকল বিদ্যাই নিষ্ফল হয়। মিষ্ট কথা দয়ার ভূষণ। অতএব বৎস!—তোমার হৃদয় মধুক্ষরণ করুক, তোমার রসনা মধুক্ষরণ করুক, তোমার চরিত্র মধুক্ষরণ করুক, এই বিশ্বসংসার তোমার মধুময় হউক।

বৎস! আমি একথাগুলি কেবল তোমাকেই বলিতেছি না, সকল ছাত্রই আমার এ কথা শ্রবণ কর। বৎস হরিশ্চন্দ্র! তুমি একটী অন্যায় কর্ম্ম করিয়া যে অনুতাপ করিতেছ, ইহাতে আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছি। আজি হইতে এই জীবনানন্দ তোমার প্রিয়বয়স্য হইল। ওহে বৎস? জীবনানন্দ! আজি তোমার বড় সৌভাগ্য। দেখ! তুমি বন্ধুহীন ছিলে, আজি হইতে হরিশ্চন্দ্র তোমার পরম বন্ধু হইল। বৎস! স্নেহ প্রদর্শন কর, তোমার প্রিয়বন্ধুর অপরাধ ক্ষমা কর।

হরি। প্রিয়বয়স্য! আমায় ক্ষমা কর।

জীব। (সহর্ষে) তোমার বন্ধুত্বলাভে আমি কৃতার্থ হইলাম। (হরিশ্চন্দ্রকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া) ভ্রাতঃ! ভাগ্যক্রমে তুমি আমার প্রিয়বয়স্য হইলে। তুমি আর আমার নিকট অপরাধী নহ। আমি এই সংসারে বন্ধুহীন হইয়া

মৃতপ্রায় ছিলাম। এখন তোমায় বন্ধু পাইয়া যেন আবার প্রাণ পাইলাম। ভ্রাতঃ! আমি অতি দীনহীন, তাই দয়া করিয়া সেই দয়াময় ঈশ্বর এ মিত্ররত্ন মিলাইলেন।

হরি। (সানন্দে) প্রিয়বয়স্য! আমি কৃতার্থ হইলাম, আনন্দে পুলকিত হইলাম। (বাহু প্রসারিত করিয়া) এস ভাই! এস, আমায় আলিঙ্গন কর। (ইহা বলিয়া জীবনানন্দের কণ্ঠ আলিঙ্গন করিল)।

উপা। (সকল ছাত্রের প্রতি) বৎসগণ! আমি অতি দরিদ্র, তাই ভাবিতেছি এখন কি উপায়ে এখানে জীবনানন্দের জীবিকা নির্ব্বাহ হয়? এ কি বা ভোজন করে? কোথায় বা শয়ন করে?

উপাধ্যায় ইহা বলিবামাত্র, ছাত্রগণের মধ্যে একটা কোলাহল উঠিল। "আমারই ভোজনের অর্দ্ধভাগ দিব," "এ আমার ভ্রাতা," "এ আমার সখা," "এ আমার প্রিয়বয়স্য," যুগপৎ সকলেই এইরূপ কহিতে লাগিল।

উপা। (শুনিয়া হর্ষগদগদস্বরে) বৎসগণ! তোমাদের হৃদয় মধুময়। আমি ধন্য! আমি পুণ্যবান্! যে আমার তোমরা হেন ছাত্র। আমি বিদ্যাদানের ফল লাভ করিলাম। আমার পরিশ্রম সার্থক হইল। আমি তোমাদের মধ্যে বাস করিয়া আর স্বর্গবাসও চাহি না। তোমাদের ন্যায় ছাত্রেরা যাহার অমূল্য নিধি, সে আবার দরিদ্র! আমি তোমাদের হৃদয় জানিবার জন্যই ঐরূপ বলিয়াছিলাম। আমিই

জীবনানন্দের জীবনোপায় করিব, আমিই ইহার পিতার কার্য্য এবং মাতার কার্য্য করিব। তোমারা সকলে যেমন আমার সন্তান, এটীও তেমনি আমার সন্তান। অতএব বৎসসকল! তোমরা ইহাকে সর্ব্বদা সোদরনির্ব্বিশেষে দেখিবে, প্রাণের তুল্য ভাল বাসিবে। তোমাদের জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে সকলের প্রতি মিত্রভাব দিন দিন বর্দ্ধিত হউক। তোমরা গুণের আলোকে সংসার আলোকিত কর। (জীবনানন্দের প্রতি) এস এস জীবনানন্দ! তুমি বড় শ্রান্ত হইয়াছ, তোমায় ক্ষুধার্ত্ত দেখিতেছি। বৎস! অগ্রে পানভোজনাদি কর, পরে যখন সুস্থ হইয়া বসিবে, তখন তোমার অবশিষ্ট বৃত্তান্ত শ্রবণ করিব।

বৎস! তুমি এখানে আমায় পিতা বলিয়া জানিও, ছাত্রগণকে সহোদর বলিয়া জানিও, এই বিদ্যালয়কে তোমার গৃহ বলিয়া জানিও, তুমি এখানে পরম সুখে বাস কর। (সকল ছাত্রের প্রতি) পুত্রগণ! দিবাভাগের আর অল্পই অবশেষ আছে, আমাদের সায়ংকৃত্য সম্পাদন করিবার সময় উপস্থিত। অতএব তোমরা সকলে মিলিয়া সমস্বরে অধ্যয়নভঙ্গসূচক বিদ্যাস্তবটী গান কর।

ছাত্রগণ। (সকলে যুগপৎ উঠিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সমস্বরে)—

জয় জয় ভারতি পরমারাধ্যে!
পরমানন্দবিধায়িনি বিদ্যে!
তব বরদানে সর্ব্ব সমৃদ্ধি,
তব গুণগানে লভি সব সিদ্ধি;

মানস-গগনে তিমির অশেষ,
নাশ বিতরি তুমি করুণালেশ ;
দেহ মা ! ভক্তি, দেহ মা শক্তি,
দেহ মা ! ভুক্তি, দেহ মা ! মুক্তি ;
দুঃখনিবারিণি মঙ্গলদাত্রি !
প্রণমি তোমারে জ্ঞানবিধাত্রি !
তুমি জগধাত্রী তুমি জগমাতা,
ত্রিজগত গায়ত তব গুণগাথা ;
সুখদে বরদে ত্রিভুবনধন্যে !
জয় জয় ভারতি ভক্তশরণ্যে !

মাতা পিতা ।

পিতা মাতা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুরু দুই জন,
যাঁহার প্রসাদে লোকে হেরে এ ভুবন।
জীবনের মহাব্রত তাঁদের সেবন,
সে ব্রত পালিবে পুত্র করি প্রাণ পণ।
সদা সুখী জনক জননী যার গুণে,
যথার্থ সুপুত্র সেই ধন্য এ ভুবনে।

সদাই সন্তান তরে পিতা মাতা অকাতরে
যে কষ্ট সহেন হায়! সঁপি দেহ প্রাণ,
তাঁদের সে উপকার কে শুধিবে তার ধার
কে আছে দেবতা পিতামাতার সমান?
মাতার হৃদয়াধারে ঝরে স্নেহ শত ধারে
কিবা আছে বসুধায় সে সুধা-সমান?
যাঁর যত্নে বাঁচে প্রাণী সাক্ষাৎ ঈশ্বরী তিনি
হৃদয়-মন্দিরে তাঁরে পূজিও সন্তান!
মা বোলে ডাকিলে সব যন্ত্রণা জুড়ায়,
মায়ের সমান বস্তু আছে কি ধরায়?।
সন্তান! মায়ের তুমি নাড়ীছেঁড়া ধন.
ভুলো না ভুলো না তাঁরে ভুলো না কখন।
সন্তানের প্রত্যক্ষ ঈশ্বর মাতা-পিতা,
তাঁদের প্রীতিতে প্রীত সকল দেবতা।

জীমূতবাহন-চরিত।

হেমকূট নগরে জীমূতকেতু নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি বহুকাল প্রজাপালন করিয়া, বৃদ্ধদশায় সর্ব্বগুণাকর জীমূতবাহন নামক পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিলেন। অনন্তর, বানপ্রস্থাশ্রম পরিগ্রহের জন্য পত্নীর সহিত মলয়াচলের

উপত্যকায় গিয়া বাস করিলেন। "আমি পিতা-মাতার চরণসেবা পরিত্যাগ করিয়া গৃহে থাকিব না এই স্থির করিয়া জীমূতবাহনও পিতা মাতার অনুগমন করিলেন, এবং দিবারাত্রি কায়মনোবাক্যে তাঁহাদের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

তাঁহাদের সেই স্থানে অবস্থানকালে, একদা মিত্রাবসু নামে এক রাজকুমার জীমূতবাহনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তিনি যথোচিত অতিথিসৎকার লাভ করিয়া, বিনীতভাবে কহিলেন, ভ্রাতঃ! আমার নাম মিত্রাবসু, আমি মলয়রাজ বিশ্বাবসুর পুত্র, আমি পিতার আদেশক্রমে আপনার নিকট আসিয়াছি। পিতা আপনাকে বলিয়াছেন,—"বৎস! জীমূতবাহন! আমার মলয়বতী নামে একটী কন্যা আছে; কন্যাটী আমাদের জীবনস্বরূপ। আমি তাহাকে তোমায় প্রদান করিতেছি, তুমি গ্রহণ কর। কন্যাটী যেন মূর্ত্তিমতী ভক্তি, বৎস! তুমিও যেন মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্ম। অতএব তোমরা উভয়ে এই স্পৃহণীয় পবিত্র সম্বন্ধে পরস্পর সম্বদ্ধ হও।"

তাহা শুনিয়া জীমূতবাহন অতি বিনীতভাবে কহিলেন,—ভ্রাতঃ! আপনাদের সহিত এ শ্লাঘনীয় সম্বন্ধ স্থাপন করিতে কে না কামনা করে? কিন্তু আমি পিতা-মাতার চরণসেবা হইতে চিত্তকে বিষয়ান্তরে নিয়োজিত করিতে পারিব না। বিশেষতঃ পূজনীয় পিতা মাতা যখন জীবিত আছেন, তখন এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ পরাধীন। অতএব আমি এ প্রস্তাবে সম্মত নহি। ইহা শুনিয়া মিত্রাবসু ভাবিলেন, ইনি জান

কথাই বলিতেছেন, ইনি গুরুজনকে উল্লঙ্ঘন করিবেন না। অতএব ইনি যাহাতে পিতার আজ্ঞায় মলয়বতীকে বিবাহ করেন তাহাই করিতে হইবে। এই বিবেচনা করিয়া, তিনি এ বিষয় তাঁহার পিতাকে গিয়া জানাইলেন।

অনন্তর জীমূতবাহন পিতা মাতার আজ্ঞায় সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় মলয়বতীকে বিবাহ করিলেন। বিবাহোৎসব সম্পন্ন হইলে, বধূ পিত্রালয় হইতে শ্বশুরের তপোবনে আগমন করিলেন, এবং চরিত্রগুণে সকলের হৃদয়ে অমৃতধারা বর্ষণ করত সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

একদা জীমূতবাহন মিত্রাবসুর সহিত সমুদ্রবেলা দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তিনি বেলার অনতিদূরে মলয়গিরির শিখরাবলীর ন্যায় অস্থিস্তূপ দর্শন করিয়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন,—সখে মিত্রাবসু! এ সকল অস্থিরাশি কাহাদের? মিত্রাবসু কহিলেন, এ সকল নাগগণের অস্থিরাশি। তাহা শুনিয়া জীমূতবাহন উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, হায়! কিরূপে এক সময়ে এত নাগের মৃত্যু ঘটিল? মিত্রাবসু কহিলেন, এ সকল মৃত্যু এক সময়ে ঘটে নাই। ইহা যেরূপে ঘটিয়াছে তাহা শুন। বিনতানন্দন গরুড় প্রতিদিন পাতাল হইতে নাগ আনিয়া এই স্থানে ভক্ষণ করিতেন। অনন্তর ক্রমে সমস্ত নাগের বিনাশাশঙ্কা দেখিয়া বাসুকি গরুড়কে কহিলেন,—হে খগেশ্বর! আপনার আগমনভয়ে সহস্র সহস্র নাগবধূর গর্ভপাত হয়, শিশুসন্তানগুলিও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়।

এইরূপে আমাদের বংশলোপ হইতেছে। অতএব আমাদের সহিত একটী নিয়ম করুন। আমি আজি হইতে প্রতিদিন একটী করিয়া নাগ আপনার ভোজনের নিমিত্ত সমুদ্রতীরে পাঠাইব। পক্ষিরাজও তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তদবধি নাগরাজ প্রতিদিন এই স্থানে এক একটী মহানাগ প্রেরণ করেন. গরুড়ও তাহাকে ভক্ষণ করেন। এইরূপে ভক্ষিত নাগগণের কঙ্কালরাশি দিন দিন এই স্থানে সঞ্চিত হইতেছে।

এই শোচনীয় ব্যাপার শুনিয়া, জীমূতবাহন ব্যথিত হৃদয়ে ভাবিতে লাগিলেন,—অহো! কি আশ্চর্য্য! জীর্ণ তৃণকণার ন্যায় অসার ও অশুচি এই দেহের জন্যও লোকে পাপাচরণ করে! নাগলোকের কি বিপদ্! আমি দেহ দিয়াও যদি একটী নাগের উদ্ধার করিতে পারি, আমার জীবন সার্থক হয়। তিনি এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময় মিত্রাবসু বিশেষ কার্য্যানুরোধে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। জীমূতবাহন বিষাদে মগ্ন হইয়া একাকী বিচরণ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে তিনি দূর হইতে শুনিলেন,—'হা পুত্র শঙ্খচূড়! মায়ের সর্ব্বস্বধন! কেমন করিয়া গরুড় তোমার এই সুন্দর শরীর ভক্ষণ করিবে। হায়! আমি দশ দিক্ শূন্য দেখিতেছি। আর আমার জীবনে কি ফল! দয়াময় পরমেশ্বর! তুমি দীনবন্ধু, আমি তোমার চরণে শরণ লইলাম, দুঃখিনীর জীবনধনকে রক্ষা কর, আমার বাছাকে আমায় ভিক্ষা দাও। উঃ! আমি কি পাষাণ! এখনও বিদীর্ণ হইলাম না!

বৎস! চন্দ্রানন! একটীবার দাঁড়াও, আমি তোমার চাঁদমুখ দর্শন করি'।

এই প্রকার করুণাপূর্ণ রোদন শুনিয়া জীমূতবাহন অতিমাত্র ব্যথিত হইলেন, ভাবিতে লাগিলেন, কে এ নারী এরূপ কাতরস্বরে রোদন করে? বুঝি সেই গরুড় আজি ইহার পুত্রকে ভক্ষণ করিবে। গরুড়ের কি নিষ্ঠুরতা! যে নৃশংস মাতৃক্রোড় হইতে শিশুসন্তান বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিতে পারে, নিশ্চয় তাহার হৃদয় বজ্র দিয়া গঠিত। আমি আমার প্রাণ দিয়া উহাকে উদ্ধার করিব। যে ব্যক্তি কাতর ও কণ্ঠাগতপ্রাণ, এ জগতে সকলেই, যাহাকে ত্যাগ করিয়াছে, পুত্রপ্রাণা জননী চতুর্দ্দিক্ শূন্য দেখিয়া যাহার জন্য হাহাকার করিতেছেন, সেই অশরণের যদি রক্ষা করিতে না পারিলাম, তবে এ দেহ ধারণের ফল কি? তিনি মনে মনে এই স্থির করিয়া দ্রুতপদে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন,—এক বৃদ্ধা পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া রোদন করিতেছেন। তিনি সম্মুখে গিয়া কহিলেন,—মা! আপনি স্থির হউন, কাঁদিবেন না, ভয় নাই, আমি গরুড়কে নিজ দেহ দান করিয়া আপনার পুত্রকে রক্ষা করিব। অথবা আর কথায় কি ফল, কার্য্যেই ইহা সম্পাদন করি। এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধা কহিলেন,—ও বাছা! অমন কথা মুখেও আনিও না, তুমি চিরজীবী হও; তোমায় ও আমার শঙ্খচূড়ে প্রভেদ কি? অথবা তুমি আমার শঙ্খচূড় হইতেও অধিক, কেন না তাহাকে

রক্ষা করিতে নিজের প্রাণ দিতে উদ্যত হইয়াছ। শঙ্খচূড় কহিল,—মহাত্মন্! আপনার অলৌকিক করুণায় মুগ্ধ হইয়াছি। আমার ন্যায় কত শত ক্ষুদ্র প্রাণী জন্মিতেছে ও মরিতেছে, কিন্তু পরহিতে বদ্ধপরিকর ভবাদৃশ মহাপুরুষ এ জগতে কয় জন জন্মিয়া থাকেন। অতএব আপনি এ সঙ্কল্প ত্যাগ করুন, আপনার প্রাণত্যাগে আমার ন্যায় একটীমাত্র ক্ষুদ্র প্রাণীর প্রাণ রক্ষা হইবে, কিন্তু আপনি জীবিত থাকিলে শত শত মহাপ্রাণীর উদ্ধার হইবে। অতএব ক্ষান্ত হউন। আমিও সমুদ্রতটে ভগবান্ দেবাধিদেবের পূজা করিয়া অবিলম্বে রাজাজ্ঞা পালন করি। শঙ্খচূড় ইহা কহিয়া জননীর সহিত দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

ইত্যবসরে, গরুড় আসিতেছে দেখিয়া জীমূতবাহন ভাবিলেন,—অহো! শুভাদৃষ্টক্রমে বুঝি আমার মনোরথ পূর্ণ হইল, এই ত গরুড় আসিতেছেন। অতএব শঙ্খচূড় না আসিতে আসিতেই বধ্যশিলায় আরোহণ করি। জন্ম জন্ম যেন আমার পরহিতের জন্যই দেহলাভ হয়। তিনি এই ভাবিয়া বধ্যশিলায় আরোহণ করিলেন, এবং পরমানন্দে গরুড়কে নিজ দেহ দান করিলেন। গরুড়ও সুতীব্র চঞ্চুকোটি দ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া ভক্ষণ করিতে লাগিলেন।

গরুড় ক্ষণকাল ভোজন করিয়া ভাবিলেন,—একি! আমি ত আজন্মকাল নাগকুল ভোজন করিতেছি, কিন্তু এরূপ আশ্চর্য্য কাণ্ড ত কখন দেখি নাই! আমি যতই ইহার দেহ

খণ্ড খণ্ড করিতেছি, বজ্রসম চঞ্চুদ্বারা মর্ম্মস্থান বিদীর্ণ করিতেছি, ততই ইহাঁর বদনে অপূর্ব্ব আনন্দ প্রকাশ পাইতেছে। ইহাঁর এ অলৌকিক ধৈর্য্য ও প্রসন্নতা দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। এখনও ইহাঁর প্রাণবায়ু বহির্গত হয় নাই, অতএব জিজ্ঞাসা করি—ইনি কে ?

এদিকে জীমূতবাহন মুমূর্ষু দশায় পতিত হইয়াও যখন দেখিলেন গরুড় ভোজনে ক্ষান্ত হইলেন, তখন ধীরস্বরে কহিলেন,—মহাত্মন্! এখনও আমার শিরামুখ দিয়া রক্ত ঝরিতেছে, এখনও আমার দেহমাংস নিঃশেষিত হয় নাই, আপনারও সম্পূর্ণ ক্ষুধাশান্তি হয় নাই, তবে কেন ভোজনে বিরত হইলেন ? তাঁহার সেই কথা শুনিয়া গরুড় মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—কি আশ্চর্য্য! এই মৃত্যুকালেও ইহাঁর এই উক্তি! এই বিষম যন্ত্রণায়ও ইহাঁর এই শান্তি! না জানি ইনি কোন মহাপুরুষ হইবেন! অনন্তর জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মহাপুরুষ! আপনি কে ? আপনার এই অদ্ভুত ধৈর্য্য ও শান্তি দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়াছি। গরুড় এইরূপ জিজ্ঞাসা করিতে করিতেই শঙ্খচূড় তথায় দ্রুতপদে উপস্থিত হইয়া সসম্ভ্রমে কহিল—কি করেন! কি করেন! এ অবিচার করিবেন না, হে গরুড়! ইনি নাগ নহেন, ইহাঁকে পরিত্যাগ করুন, আমাকে ভক্ষণ করুন, নাগপতি আপনার আহারের নিমিত্ত আজি আমাকেই পাঠাইয়াছেন। সেই সময় শঙ্খচূড়কে তথায় উপস্থিত দেখিয়া, জীমূতবাহন অত্যন্ত বিষণ্ণ হইলেন, ভাবিলেন,—হায়!

বুঝি আমার মনোরথ সফল হইয়াও হইল না। গরুড় শঙ্খচূড়কে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন,—আঁ। যদি তোমাকেই নাগরাজ পাঠাইয়াছেন, তবে আমি কোন্ মহাত্মাকে সংহার করিলাম? শঙ্খচূড় কহিল,—ইনি ধার্ম্মিককুলতিলক বিশ্বহিতৈষী দয়াবীর জীমূতবাহন। হায়! আপনি কি সর্ব্বনাশ করিলেন! গরুড় ইহা শুনিয়া বিষাদে অভিভূত হইয়া ভাবিলেন,—হায়! আমি কি করিলাম, আমি জীবলোকের পরম বন্ধু জীমূতবাহনের প্রাণ সংহার করিলাম! নিশ্চয় ইনি এই নাগের প্রাণ রক্ষা করিতে নিজ দেহ দান করিয়াছেন। আমি ঘোর দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি, অধিক কি, করুণানিধান সাক্ষাৎ বুদ্ধদেবকেই সংহার করিয়াছি। আমি নিশ্চয় দুস্তর পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইলাম। অনন্তর জীমূতবাহনকে কহিলেন, হে মহাত্মন্! আমি বিষম নরকাগ্নির জ্বালায় দগ্ধ হইতেছি, যাহাতে আমার এ মহা-পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়, যাহাতে আমি এ অসহ্য যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হই, আমাকে তাহা বলিয়া দিন। জীমূতবাহনের প্রাণবায়ু তখন কণ্ঠাগত. তিনি অতি কষ্টে কহিলেন,—বিনতানন্দন! আজি হইতে জীবহিংসা হইতে নিবৃত্ত হউন, সর্ব্বভূতে অভয় দান করুন, আত্মকৃত পাপের জন্য অনুতাপ করুন, পরোপকার ব্রতে দীক্ষিত হউন, ক্রমে শান্তি লাভ করিতে পারিবেন। আর আমার বলিবার শক্তি নাই. আমার প্রাণ বহির্গত হইতেছে। ও জননি! পিতঃ! আপনাদের চরণে এই আমার শেষ প্রণাম! এই কথা বলিতে বলিতেই তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

তাঁহাকে গতাসু দেখিয়া, শঙ্খচূড় হাহাকার করিয়া কহিল, হা জীমূতবাহন! হা বিশ্ববন্ধো! হা গুণনিধে! এই হতভাগার জন্যই আপনি জীবলোক পরিত্যাগ করিলেন। হা মহাপুরুষ! হা পরমকারুণিক! হা পরদুঃখকাতর! হা অকারণমিত্র! কোথায় গেলেন? আমি কাতরস্বরে আপনাকে ডাকিতেছি, আসিয়া আমার শোক শান্তি করুন। হায় রে গরুড়! আজি তুমি জগৎ অনাথ করিলে! বিশ্বের আলোক নির্ব্বাণ করিলে! দানতারণ দয়াসিন্ধু জীমূতবাহনকে বিলুপ্ত করিলে! হে লোকপালগণ! স্বর্গ হইতে অমৃতধারা বর্ষণ করিয়া এই মহাত্মাকে জীবিত করুন।

এদিকে গরুড় শোকার্ত্ত হৃদয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—হায়! আমি এই মহাত্মার অমূল্য জীবন হরণ করিলাম! এক্ষণে কি উপায়ে ইহাঁকে জীবিত করি, কিরূপে এ দুস্তর কলঙ্কসাগর পার হই। শঙ্খচূড়ের কথায় ভাল মনে হইল! দেবলোকে মৃতসঞ্জীবন অমৃত আছে, ক্ষণকালমধ্যেই সেই অমৃত আনিয়া ইহাঁকে জীবিত করি। তিনি ইহা স্থির করিয়া প্রলয়বেগে নিমেষমধ্যে দেবধামে গমন করিলেন, এবং তথা হইতে অমৃত আনিয়া জীমূতবাহনের গাত্রে সেচন করিলেন। অমৃতস্পর্শে জীমূতবাহনও পুনর্জ্জীবন লাভ করিলেন। তখন গরুড় তাঁহার চরণে মস্তক নত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন,—'আমি এতদিন ঘোর মোহনিদ্রায় অভিভূত ছিলাম, কৃপা করিয়া আপনিই আমাকে জাগরিত করিলেন, আমি

আজি হইতে সর্ব্বপ্রকার প্রাণিহিংসায় বিরত হইলাম। আপনি পরহিতে জীবন বিসর্জ্জন করিয়া যে কীর্ত্তি রাখিলেন, যাবৎ চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে, আপনার এ কীর্ত্তি বিদ্যমান থাকিবে'। ইহা বলিয়া, বিনতানন্দন বিনীতভাবে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন, জীমূতবাহনও আশ্রমে প্রতিগমন করিলেন।

পরোপকার।

সকল ধর্ম্মের মর্ম্ম, সংসারের সার,
সর্ব্বমতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পর-উপকার।
সকল পুণ্যের গুরু জানিবে ইহায়,
আর যত পুণ্য লঘু এর তুলনায়।
দীনহীন অশরণে যে জন উদ্ধারে,
তাহা হতে বড় লোক না দেখি সংসারে।
এ ভুবনে ধন্য সেই সাধু মহাশয়,
দীনদুঃখে গলে যাঁর কোমল হৃদয়।
তাঁকেই দেবতা বলি, যিনি অকাতরে
ধন মান দেহ প্রাণ দেন পর-তরে।
সাধিলে লোকের হিত যে সুখ তাহায়,
তার কাছে স্বর্গ-সুখ তুচ্ছ বলা যায়।
তৃণাগ্রে বারির ন্যায় জীবন চঞ্চল,
সন্ধ্যা-মেঘ-শোভা-সম বিভব সকল।

প্রকৃতির এই গতি দেখ সর্ব্বজন,
ত্যজ লোভ, পরহিতে কর প্রাণ পণ।
বিশ্বহিতে সদা যাঁর হৃদয়ের টান,
গরভে ধরুন মাতা সেই সুসন্তান।

পাণ্ডবগণের মহাপ্রস্থান।

পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির হস্তিনার রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া সাক্ষাৎ ধর্ম্মের ন্যায় প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার রাজ্যে বাস করিয়া কেহ স্বর্গরাজ্যও কামনা করিত না। পঞ্চ পাণ্ডব প্রজাগণের যেন পঞ্চ প্রাণবায়ু ছিলেন। অসংখ্য প্রজাপুঞ্জের প্রতিহৃদয়েই সদ্ভাব এবং সেই বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিগৃহেই শান্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণের পরম বন্ধু ছিলেন। পাণ্ডবেরা ক্ষণকালও তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না। কালক্রমে যখন সর্ব্বনাশকর সুরাপানে বিশাল যদুবংশ বিনষ্ট হইল, তখন শ্রীকৃষ্ণ মানবলীলা সংবরণ করিলেন। এদিকে, কৃষ্ণবিরহে কৃষ্ণগতপ্রাণ পাণ্ডবগণের হৃদয়ে নির্ব্বেদ জন্মিল। যুধিষ্ঠির সংসার অসার ভাবিয়া অচিরেই নিজ পার্থিব কর্ত্তব্যসকল সমাপন করিলেন। অনন্তর পাণ্ডবেরা সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক দ্রৌপদীর সহিত রাজভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। একটী কুক্কুর তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

প্রজাবৎসল যুধিষ্ঠির সংসারত্যাগী হইয়া চলিলেন, আর ফিরিবেন না, এই বার্ত্তা মুহূর্ত্তমধ্যে সর্ব্বত্র রটিত হইল, পৌর ও জানপদবর্গে 'তুমুল আর্ত্তনাদ উঠিল। প্রজাপুঞ্জের অবিরল অশ্রুধারায় ধরণী অভিষিক্ত ও হাহাকারে দশ দিক্ বিদীর্ণ হইতে লাগিল। গৃহধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সকলে তাঁহাদের অনুগমন করিতে লাগিল; যুধিষ্ঠির নানামতে বুঝাইয়া অনেক কষ্টে তাহাদিগকে ফিরাইলেন। অনন্তর, তিনি চারি ভ্রাতা ও পত্নীর সহিত প্রস্থান করিলেন। সেই কুক্কুরও ছায়ার স্থায় তাঁহাদের অনুগামী হইল। ক্রমে তাঁহারা সমস্ত পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া সুমেরু পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সেই গিরিবরে আরোহণ করিতে করিতে, তাঁহাদের প্রিয়তমা পত্নী দ্রৌপদী অকস্মাৎ গতাসু হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। তাঁহাকে পতিত দেখিয়া ভীম যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসিলেন,—আর্য্য! রাজকুমারী দ্রৌপদী ত কখন কোন অধর্ম্ম করেন নাই, তবে কি কারণে ইহাঁর পতন হইল?

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—'হে পুরুষপুঙ্গব! রাজনন্দিনী কৃষ্ণা সর্ব্বাপেক্ষা অর্জ্জুনের প্রতি অধিক অনুরাগিণী ছিলেন, সেই পক্ষপাতদোষেই শেষে ইহাঁর পতন হইল। যে স্থলে সকলের প্রতি সমান অনুরাগ স্থাপন করিতে হইবে, সে স্থলে পক্ষপাত একটী মহাপাপ'। তিনি এই কথা বলিয়া পরমাত্মায় চিত্ত সমাহিত করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অনন্তর, তাঁহারা কিয়দ্দূর আরোহণ করিতে করিতে, সহদেব অকস্মাৎ প্রাণশূন্য

হইয়া পতিত হইলেন। তাঁহাকে পতিত দেখিয়া ভীম যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন,—আর্য্য! যিনি বিনীত, শান্ত ও সকলের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন, সেই সহদেব আজি কি পাপে পতিত হইলেন?

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—'ইনি কাহাকেও আপনার সমান বিজ্ঞ বলিয়া জ্ঞান করিতেন না, এই অভিমানেই রাজকুমার সহদেবের পতন হইল। অন্যের অপেক্ষা আপনাকে অধিক বিজ্ঞ মনে করা একটী মহাপাপ'। এই বলিয়া তিনি গমন করিতে লাগিলেন, অবশিষ্ট তিন ভ্রাতা ও সেই সারমেয় নিঃশব্দে তাঁহার অনুগমন করিল। কিয়দ্দূর আরোহণ করিতে করিতে, নকুল গতাসু হইয়া পতিত হইলেন। ভীম পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসিলেন,—আর্য্য! ধর্ম্মে যাঁহার অচলা ভক্তি ছিল, যিনি গুরুজনের আজ্ঞাবহ ও রূপে অনুপম ছিলেন, আজি কি পাপে সেই নকুলের পতন হইল?

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—'ইনি মনে করিতেন যে আমার তুল্য রূপবান্ ও গুণবান্ আর কেহই নাই। নকুল এই পাপেই পতিত হইলেন। আপনার রূপগুণের অভিমান একটী মহাপাপ। বৎস ভীম! চলিয়া আইস, যাহার যে কর্ম্মফল, তাহাকে তাহা অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে।' অনন্তর, তাঁহারা ক্রমে ঊর্দ্ধতর প্রদেশে আরোহণ করিতে করিতে, বিশ্ববিজয়ী মহাবীর অর্জ্জুন ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় অকস্মাৎ পতিত হইলেন। দিব্যপ্রভাব অর্জ্জুনের পতন দেখিয়া, ভীম পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসিলেন,—আর্য্য! পরিহাসছলেও যিনি কখন মিথ্যা

করেন নাই, শৌর্য্যে ও বীর্য্যে যিন অদ্বিতীয় ছিলেন, সেই পুরুষসিংহ অর্জ্জুন আজি কি পাপে পতিত হইলেন ?

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—'ইনি পৃথিবীর যাবতীয় বীরপুরুষকে লঘু জ্ঞান করিতেন, অশেষ গুণের আধার হইয়াও ইনি আত্মাভিমান ত্যাগ করিতে পারেন নাই, এই দোষেই ধনঞ্জয়ের পতন হইল। বীরপুরুষের বীর্য্যাভিমান একটী মহাপাপ'। তিনি ইহা কহিয়া নিঃশব্দে চলিলেন। একমাত্র ভীম ও সেই কুকুর তাঁহার অনুগামী হইল। তাঁহারা কিয়দ্দূর অতিক্রম করিলে, অকস্মাৎ ভীমসেন পতিত হইলেন, যেন সুমেরুর একটী চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। ভীম পতনকালে আর্ত্তনাদ করিয়া কহিলেন,—আর্য্য ! বলুন আমার কি পাপে পতন হইল ?

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—'ভ্রাতঃ ! তুমি অন্যের দিকে না চাহিয়া নিজেই অধিক ভোগ করিতে, এবং সর্ব্বদা নিজ বাহুবলের শ্লাঘা করিতে, এই পাপেই তোমার পতন হইল'। তিনি ইহা কহিয়া, ঈশ্বরে চিত্ত সমাধান পূর্ব্বক উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিতে লাগিলেন। এক্ষণে একমাত্র কুকুর তাঁহার অনুগমন করিল। কঠিন পাষাণে পদতল ক্ষত বিক্ষত হইলেও সারমেয় কিছুতেই তাঁহার সঙ্গ ছাড়িল না। পথিমধ্যে অকস্মাৎ তাঁহার সম্মুখে দেবরথ আবির্ভূত হইল, স্বয়ং দেবরাজ তাহাতে আসীন ছিলেন। সুরনাথ যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,— 'বৎস ! আমি সুরপতি ইন্দ্র, তোমাকে লইতে আসিয়াছি, তুমি অলৌকিক পুণ্যবলে দেবলোকে আরোহণ কর'।

যুধিষ্ঠির সসম্ভ্রমে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে কহিলেন,—হে সুরেশ্বর! যাঁহারা আমার আশ্রিত ও ভক্ত, আমার সেই প্রাণাধিক আত্মীয় ও বন্ধুগণের কি গতি হইল? আমি তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া একাকী স্বর্গভোগ করিতে অভিলাষী নহি, আর এই কুক্কুর ছায়ার ন্যায় আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছে, ভীষণ সঙ্কটেও নিরস্ত হয় নাই। আমি ইহার অনুরাগ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি, অতএব এরূপ ভক্তকে ফেলিয়াই বা কিরূপে গমন করি। ইন্দ্র কহিলেন,—ছি! ছি! এ কি কহিতেছ! এ ঘৃণিত শ্বাপদকে এখনি পরিত্যাগ কর। দেবদুর্লভ সম্পদ তোমার প্রতীক্ষা করিতেছে। এই কুক্কুরজাতি অতি অশুচি হিংস্র ও হেয়, ইহাকে এখনি ত্যাগ কর।

তাঁহার সেই কথা শুনিয়া, যুধিষ্ঠির ধীরস্বরে কহিলেন,—বিভো! এ মনুষ্য হউক, শ্বাপদ হউক, কীট হউক, বা কীটাণু হউক, এ আমার ভক্ত ও আশ্রিত; আমি ভক্ত ও আশ্রিতের সহিত বরং ঘোর নরকেও যাইব কিন্তু তাহাকে ছাড়িয়া অক্ষয় স্বর্গেও যাইব না। ইন্দ্র কহিলেন,—হায়! এ নিশ্চয় তোমার মতিভ্রম ঘটিয়াছে, নহিলে একটা অস্পৃশ্য, ক্ষুদ্র ও অধম শ্বাপদের জন্য স্বর্গের সুখ ত্যাগ করিতেছ। অতএব এ দুর্বুদ্ধি পরিত্যাগ কর। যুধিষ্ঠির কহিলেন,—ভগবন্! আমি ঈশ্বরের এ প্রেমময়ী সৃষ্টির মধ্যে কোন জীবকেই অস্পৃশ্য, ক্ষুদ্র বা অধম বলিয়া জ্ঞান করি না। সর্ব্বজীবে অভেদ প্রেম আমার জীবনের মহাব্রত; এ মহাব্রতের নিকট স্বর্গসুখও তুচ্ছ বলিয়া জ্ঞান করি।

সর্ব্বজীবকে আত্মসম জ্ঞান করিতে করিতে যদি আমার নরকেও গতি হয়, হউক। ভগবন্! প্রসন্ন হউন; বিশ্বাসপ্রতিপন্ন, ভক্ত ও পীড়িত সহচরকে ত্যাগ করিয়া আমার স্বর্গভোগে কাজ নাই। আর যদি আমার প্রতি একান্তই দয়া প্রকাশ করেন, তবে আমার সমস্ত পুণ্য লইয়া এই কুক্কুর স্বর্গে গমন করুক।

যুধিষ্ঠির এই কথা বলিতে বলিতেই সেই কুক্কুর দিব্যরূপ ধারণ করিল। অনন্তর সেই জ্যোতির্ম্ময় দিব্যপুরুষ অমৃতমধুর বাক্যে যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—বৎস! আমি স্বয়ং ধর্ম্ম, তোমাকে পরীক্ষা করিতে কুক্কুরদেহ ধারণ করিয়াছিলাম। আমি তোমার ঐকান্তিক ভক্তি ও বিশ্বপ্রেমে পুলকিত হইয়াছি। এই সংসার মহাপরীক্ষার সাগর; তুমি অলৌকিক ধর্ম্ম-বলে সেই পরীক্ষাসাগর পার হইয়াছ। এক্ষণে তোমার কঠোর সাধনার ফল লাভ কর; তুমি অমৃতময় ব্রহ্মলোকে বাস করিয়া অক্ষয় আনন্দ উপভোগ কর। যুধিষ্ঠির কহিলেন,—ভগবন্! যদি আমার প্রতি সদয় হইয়া থাকেন, তবে যথায় আমার সেই জ্ঞাতি বন্ধু সকলে গমন করিয়াছেন, আমাকেও তথায় লইয়া চলুন। ধর্ম্ম কহিলেন,—বৎস! সর্ব্বোত্তম পুণ্যে তুমিই সর্ব্বোত্তম পদ লাভ করিবে, তোমার আত্মীয়গণ অধম লোকে গমন করিয়াছেন, অতএব কিরূপে তাহাদের সহিত তোমার পুনর্ম্মিলন ঘটিবে?

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—"সুখময় হউক, আর দুঃখময় হউক, যে স্থানে আমার মিত্রগণ গমন করিয়াছেন, আমি সেই স্থানেই

কামনা করি ; আর কোন স্থান চাহি না। বন্ধুগণকে ছাড়িয়া অক্ষয় ব্রহ্মলোকেও বাস করিবার সাধ নাই। যথায় আমার বন্ধুরা গমন করিয়াছেন, তাহাই আমার স্বর্গ, আর যাহা আপনি দিতেছেন তাহা আমার স্বর্গ নহে।"

কর্ণচরিত।

কুন্তীর নন্দন কর্ণ সূতের পালিত,
'দাতাকর্ণ' নামে যিনি ভুবনে বিদিত।
অস্ত্রবিদ্যা শিখিবারে বালক যখন,
পরশুরামের পদে নিলেন শরণ।
গুরুভক্তি, সমাধি সংযম, দৃঢ় পণ,
হেরি তাঁর তুষ্ট অতি ভৃগুর নন্দন।
শিখান বিবিধ বিদ্যা করিয়া যতন ;
শিখেন সে সব কর্ণ করি প্রাণপণ।
  একদিন উপবাসে কৃশ মুনিবর ;
নিদ্রার আবেশে বড় হ'লেন কাতর।
অবশেষে কর্ণ কোলে রাখি নিজ শির,
অকাতরে নিদ্রা যাইলেন ভৃগুবীর।
হেনকালে কীট এক ঘোর রুক্ষকায়,
তীক্ষ্ণদন্ত, রক্তপায়ী আসিল তথায়।

কর্ণের উরুতে কীট উঠিয়া সত্বর,
অস্থি চর্ম্ম ভেদ করি পশিল ভিতর।
বজ্রদন্তে বজ্রকীট কাটে তাঁর উরু;
উরুর অপর প্রান্তে নিদ্রা যান গুরু।
পাছে তাঁর নিদ্রা ভাঙ্গে কীটে নিবারিতে,
ভাবি কর্ণ না পারেন নড়িতে চড়িতে।
অস্থিভেদী ঘোর বজ্রকীটের দংশন,
সহিলেন শিশু কর্ণ অম্লানবদন।
শোণিত লাগিলে গায়ে জাগিয়া অমনি;
পরম বিস্ময়ে তবে কহিলেন মুনি।
এ কি ভয়ানক কাজ না জানি তোমার!
কোথা হ'তে বহে ঘন রুধিরের ধার?
কহ কহ শীঘ্র করি, একি বিপরীত!
কেমনে আইল হেথা এতেক শোণিত।
বিনয়বচনে কর্ণ বলেন তখন,
যেইরূপে কীটে উরু করে বিদারণ।
প্রভুর বিশ্রামভঙ্গে বড় ভয় করি;
কীটে না নিবারি তাই, না নড়িতে পারি।
গুরুদেব! তব শির কোলেতে ধরিয়া,
অটল অচল ভাবে রয়েছি বসিয়া।
বালক শিষ্যের সেই সহিষ্ণুতা শুনি,
চমকিত হইলেন জামদগ্ন্য মুনি।

ঘন ঘন মুখে তার চুম্বন করিয়া
কহিলেন, মুনি, কর্ণে কোলেতে লইয়া।
ধন্য ধন্য ধৈর্য্য তব! না দেখি না শুনি;
যে বর মাগহ বৎস! দিতেছি এখনি।
ভুবনবিজয়ী হবে বীরচূড়ামণি;
তোমার সুপুণ্যে ধন্য হইবে ধরণি।
বিস্ময় মানিবে বিশ্ব শুনি তব দান;
'দাতা কর্ণ' নামে তব ঘুষিবে সম্মান।
তোমার সমান ধৈর্য্য সমাধি যাহার;
দুর্লভ বিভব সব সুলভ তাহার।
গুরুপদে নতশির হ'য়ে শতবার;
হৃদয়ে রাখেন কর্ণ গুরুর সে বর।

স্বাস্থ্যরক্ষা।

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, যাহা কিছু বল,
শরীর থাকিলে ভাল লভি সে সকল।
হেন সুমঙ্গল দেহ করিতে রক্ষণ,
পরম যতন সবে কর অনুক্ষণ।
কুপথ্যে আসক্ত যেই হয় দুরাচার;
সে হানে আপন গায়ে আপনি কুঠার।
কিছুদিন রোগভোগ করি এ সংসারে,
মরে আর মেরে যায় নিজ পরিবারে।

কিম্বা যদি দীর্ঘকাল বাঁচে সেইজন,
কেবল যাতনা পায় যাবত জীবন ;
না থাকিল যদি সুখ থাকিতে জীবন ;
জীবন মরণ সেই জীবন মরণ।

ক্ষণিক সুখের তরে স্বাস্থ্য-ভঙ্গ যেই করে
অকালে জীবনে মরে সেই বুদ্ধিহীন ;
যদি হিতে থাকে আশা, সর্ব্বজনে ভালবাসা,
না হইও সর্ব্বনাশা নেশার * অধীন।

দেহ মন শুদ্ধ যার অনাচার অত্যাচার
বিষসম পরিহার করে যেই জন ;
তারে না ভুগিতে হয় রোগের যাতনাচয়,
সদাকাল সুখময় হেরে সে ভুবন।

হও তবে সাবধান কর দোষ বিষজ্ঞান,
যদি চাও ধন মান জীবন যৌবনে ;
সময়ে শুনহ হিত না করিও বিপরীত,
হও সদা অবহিত আত্মার পালনে।

মন্দ পথে যদি চল নিজেই ভুগিবে ফল,
কুকাজের প্রতিফল ফলে হাতে হাতে ;
এ সংসারে কারো তরে কেহ নাহি প্রাণে মরে
যে মরে সে মরে,, নাহি সন্দেহ তাহাতে।

---

* মদ্যকার্য্যে আসক্তিকে নেশা বলে।

মরে যেই অনাচারে, আত্মঘাতী বলে তারে,
কেবা আছে এ সংসারে পাপী সম তার ?
আত্মঘাতী দুরাচার, অনন্ত নরক তার,
আর সদা হাহাকার হয় তার সার।

পরিশ্রম, আর সদা নিয়ম-পালন,
ইহাতেই রক্ষা পায় দুর্লভ জীবন।
স্রোত না বহিলে নদী বিকৃত যেমন;
চালনা বিহনে দশা দেহের তেমন।
শারীরিক, মানসিক, দুইরূপ শ্রম,
যথাকালে যেই করে করিয়া নিয়ম,
উন্নতির দ্বার তার হয় অবারিত,
সকল মঙ্গল ফল সে লভে নিশ্চিত।
শারীরিক শ্রমে হয় শরীর ধারণ,
মানসিক শ্রমে মন লভে জ্ঞানধন।

শারীরিক পরিশ্রম যেবা আছে যত,
নহে হিতকর কেহ ভ্রমণের মত।
শরীর রাখিতে ভাল হয় যদি মন,
সকালে বিকালে নিত্য করিবে ভ্রমণ।
প্রশস্ত জনতাহীন রম্য পরিষ্কার,
বিশুদ্ধ বায়ুর যথা সতত সঞ্চার;
উদ্যান, নদীর ধার, অথবা ময়দান;
এসকল ভ্রমণের উপযুক্ত স্থান।

ঋতুর উচিত্ত যাহা, পরি সে বসন,
পুলকিত চিতে নিত্য করিবে ভ্রমণ।
নীরোগ সবল দেহ ধরে যেই নর,
ব্যায়াম তাহার পক্ষে বড় হিতকর।
শীত আর মধুমাস এই মাস চারি,
ব্যায়ামের গুণ নাহি বর্ণিবারে পারি।
অথবা সকল কালে নিজ শক্তিমত,
সকলেই ব্যায়াম করিবে নানামত।
কপালে বগলে গালে গড়াইলে ঘাম,
ঘন শ্বাস বহিলেই ছাড়িবে ব্যায়াম।
একেবারে পরিশ্রম না করা যেমনি,
অতিশ্রম দোষাবহ জানিবে তেমনি।
ব্যায়ামের গুণে কাজে সদা মন যায়,
চাঁচা ছোলা সবল সুদৃঢ় হয় কায়।
না আসে সহসা কোন শত্রু তার পাশে,
অসময়ে জরা মৃত্যু নাহি তারে গ্রাসে।
বাসস্থান, স্নান, পান, অশন, বসন,
শয়ন, ভ্রমণ, ক্রীড়া, সঙ্গ, আলাপন,
সকলি নির্ম্মল যার আর দেহ মন,
এ জগতে সর্ব্বসিদ্ধি লভে সেই জন।

বাক্‌পুষ্টা।

এই প্রাতঃস্মরণীয়া নারী কাশ্মীরপতি মহারাজ তুঞ্জীনের মহিষী ছিলেন। বাক্‌পুষ্টা পতির সহিত ধর্ম্মাসনে অভিষিক্ত হইয়া সর্ব্বপ্রকার রাজকার্য্যে পতির সহায়তা করিতে লাগিলেন। মহারাজ তুঞ্জীন সেই ধর্ম্মশীলা পত্নীর পরামর্শ ভিন্ন কোন কার্য্য করিতেন না। অন্যান্য গৃহিণীর কার্য্যক্ষেত্র যেরূপ সঙ্কীর্ণ, কেবল আপনার গৃহকার্য্য ও কতিপয়মাত্র পরিজনের প্রতিপালনেই সীমাবদ্ধ, রাজগৃহিণীর কার্য্যক্ষেত্র সেরূপ সঙ্কীর্ণ নহে। যাঁহার হস্তে অগণ্য পরিজনের ও অসংখ্য প্রজার প্রতিপালনের ভার, যাঁহাকে বিভিন্নপথাবলম্বী কোটি কোটি লোকের মনোরঞ্জন করিতে হইবে, যাঁহার বিবেচনার উপর একটা বিশাল রাজ্যের ভদ্রাভদ্র নির্ভর করে, তাঁহার ধৈর্য্য, বীর্য্য, দয়া, দাক্ষিণ্য কিরূপ হওয়া উচিত, তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ ও পবিত্রতার প্রভাব কিরূপ হওয়া উচিত, বাক্‌পুষ্টা ইহারই একটা উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

সেই রাজা ও রাজ্ঞী স্বল্পকালমধ্যে সমস্ত প্রজার হৃদয় অধিকার করিলেন। এ সংসারে বিপদ্ ভিন্ন মনুষ্যের প্রকৃত পরীক্ষা হয় না। যেমন অগ্নি কাঞ্চনের পরীক্ষাস্থান, তেমনি বিপদ্‌ই ধার্ম্মিকের পরীক্ষাস্থান। দৈবঘটনায় তাঁহাদের সেই কঠোর পরীক্ষা আরম্ভ হইল। যেন তাঁহাদের চরিত্রপরীক্ষার জন্যই প্রজামধ্যে এক দুঃসহ দৈব বিপদ্ উপস্থিত হইল। একদা ভাদ্রমাসে, যখন সমস্ত কেদারমণ্ডল পাকোন্মুখ শালিশস্যে

সমাচ্ছন্ন, তখন কাশ্মীরে অকস্মাৎ ঘোর তুহিনপাত হইতে লাগিল। অচিরেই দেশের সমস্ত শস্য হিমানীগর্ভে নিমগ্ন হইল, সেই সঙ্গে প্রজার জীবনাশাও বিনষ্ট হইল। ক্রমে রাজ্যে ঘোর দুর্ভিক্ষানল প্রজ্বলিত হইল।

একটী সন্তান পীড়িত হইলে তাহার শুশ্রূষা পিতামাতার পক্ষে কিরূপ গুরুতর, তাহা একবার ভাবিয়া দেখ ; তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে, যাঁহাদের হস্তে অসংখ্য পীড়িতের শুশ্রূষার ভার, তাঁহাদের কর্ত্তব্য কিরূপ গুরুতর। এক্ষণে সেই রাজদম্পতীর হস্তে দুর্ভিক্ষপীড়িত অনন্ত প্রজার প্রাণরক্ষার ভার পতিত হইল। অন্ন বিনা দেশে হাহাকার উঠিয়াছে ; অনাহারে দিন দিন শত শত লোক প্রাণত্যাগ করিতেছে ; তদ্দর্শনে রাজা ও রাজ্ঞী বিপত্তিহারী জগদীশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া প্রজারক্ষায় দীক্ষিত হইলেন। গৃহে, অরণ্যে, পথে, শ্মশানে, আশ্রমে, কান্তারে, আপণে, নদীতটে যে যেখানে অনাহারে পতিত, তাঁহারা সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া তাহার মুখে অন্নজল প্রদান করিতে লাগিলেন। মহিষী, শত শত নিরন্নকে অন্ন দিবার জন্য এককালে যেন শত শত মূর্ত্তি ধারণ করিলেন ; প্রজারা যেন এক অন্নপূর্ণার অসংখ্য রূপ দর্শন করিতে লাগিল।

প্রজার জন্য বিদেশ হইতে অন্ন ক্রয় করিতে ক্রমে রাজকোষ নিঃশেষিত হইল, ক্রমে রাজার ও মন্ত্রিগণের সঞ্চিত অর্থ সকলি নিঃশেষিত হইল। হায়! দৈববলের সহিত ক্ষুদ্র মানবশক্তি কতক্ষণ যুঝিতে পারে; শেষে সকল উপায়ই ফুরাইল।

মহিষী প্রজার জন্য গাত্রের অলঙ্কার উন্মোচন করিলেন, পরিধেয় পর্যাস্ত বিক্রয় করিয়া প্রজার অন্ন ক্রয় করিলেন। পুত্রপ্রাণা জননী যে বেশে মুমূর্ষু শিশুকে ক্রোড়ে করে, মহিষী শেষে সেই সর্ব্বত্যাগিনীর বেশে আলুলায়িত কেশে গৃহে গৃহে অন্নমুষ্টি লইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু আর কিছুতেই রক্ষা হয় না। পিতা মাতা অপত্যপ্রেম বিস্মৃত হইল, জায়া পতি দাম্পত্যপ্রেম বিস্মৃত হইল, ভ্রাতা ভগিনী সোদরপ্রেম বিস্মৃত হইল। সকলেই স্বোদরপূরণে উন্মত্ত। দেশের শূর, বীর, পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, নির্ধন, সকলেই সমভাবে কালগ্রাসে পতিত হইতে লাগিল। যাহারা জীবিত, তাহাদেরও আর মনুষ্যের আকার নাই, সকলে কঙ্কালমাত্রাবশিষ্ট; উৎকট জঠরজ্বালায় জ্বলিত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিকট কটাক্ষপাত করিতেছে; একমুষ্টি অন্ন লইয়া মাতা-পুত্রে ঘোরতর বিবাদ বাঁধিয়াছে। সমস্ত দেশ যমপুরীর ন্যায় ঘোরদর্শন প্রেতবৃন্দে সমাকীর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

সেই লোমহর্ষণ ভীষণ সময়ে, গভীর নিশীথকালে, একদা যখন সমস্ত রাজভবন নিঃশব্দ, নরপতি শয়নকক্ষে সহসা হাহাকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার গভীর আর্ত্তনাদে গৃহভিত্তি সকল বিদীর্ণ হইতে লাগিল। মহিষী শান্তিকামনায় ইষ্টদেবতার ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন, পতির রোদন শুনিয়া অমনি তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিলেন। রাজা শোকোন্মত্ত হইয়া কহিতে লাগিলেন,—দেবি! রাজার পাপ ভিন্ন প্রজার অমঙ্গল হয় না।

নিশ্চয় আমারি দোষে নিরপরাধ প্রজালোকের এই সর্ব্বনাশ উপস্থিত; আমারি ভাগ্যদোষে আজি ধরণী অন্নশূন্যা হইয়াছেন। যাহা কিছু উপায় ছিল সকলি বিফল হইল; নিদারুণ কালের হস্তে সর্ব্বস্বান্ত হইল। দুরন্ত দাবানলে বারিবিন্দুর ন্যায় আমাদের সমস্ত যত্ন লয় পাইল। দেখ! চক্ষের উপর কত শত মহাপ্রাণী বিনষ্ট হইতেছে; শিশুসন্তানগুলি মাতার বিবশ বাহুপাশ হইতে স্খলিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতেছে। কোথাও ক্ষুধার্ত্তের সকরুণ প্রার্থনা, কোথাও রোগার্ত্তের যাতনাময় চিৎকার, কোথাও শোকার্ত্তের পাষাণভেদী আর্ত্তনাদ, কোথাও মুমূর্ষুর অন্তিম-কাতরতা; আমার সেই অমরাবতী কাশ্মীর আজি মহাশ্মশান হইয়াছে। কেহ পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিবে, তাহারও পথ নাই; হিমসংঘাতে চারিদিকের পর্ব্বতশ্রেণী অলঙ্ঘ্য, পথ ঘাট সকলি রুদ্ধ; এস্থান হইতে নির্গমন করা মনুষ্যশক্তির অতীত। সূর্য্যদেব যেন রসাতলে প্রবেশ করিয়াছেন, ঘোর ঘনঘটায় দশ দিক্ নিরন্তর আচ্ছন্ন রহিয়াছে, যেন শত শত কালরাত্রি আসিয়া ঘেরিয়াছে। তরুকোটরের দ্বার রুদ্ধ হইলে তন্মধ্যে বিবশ পক্ষিশাবকদিগের যে দশা হয়, আমার প্রজাগণেরও সেই দশা উপস্থিত। হে দেবি! যাহারা আমার প্রাণের উপাদান, আমি সেই প্রিয়তম প্রজাগণের এ দুর্গতি আর দেখিতে পারি না; আমি জ্বলন্ত হুতাশনে এ দেহ আহুতি দিব। ধন্য সেই নরপালগণ! যাঁহারা প্রাণাধিক প্রজাগণকে সর্ব্বতোভাবে সুস্থ দেখিয়া রাত্রিকালে সুখে নিদ্রা [illegible]

দেবি! জানি না কি মহাপাপে আমরা সে সুখে বঞ্চিত হইলাম। নরপতি ইহা কহিতে কহিতে মূচ্ছির্ত হইয়া মহিষীর ক্রোড়ে পতিত হইলেন। মহিষী এতক্ষণ নিস্পন্দ হইয়া ঐ সকল কথা শুনিতেছিলেন; অকস্মাৎ তাঁহার বদনে দিব্য জ্যোতিঃ আবির্ভূত হইল, তিনি যেন কোন দিব্য শক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিতা হইলেন। তিনি সুপ্তোত্থিতার ন্যায় উঠিয়া পরম যত্নে পতির চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। অনন্তর স্থির ও গম্ভীর স্বরে কহিতে লাগিলেন। সেই নিশীথনির্বাত বক্ষমধ্যে দীপসকল স্তিমিতভাবে জ্বলিতেছিল, অকস্মাৎ সে সকল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, যেন মহিষী কি বলিবেন শুনিবার জন্যই গ্রীবা উন্নত করিয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিল। মহিষী কহিলেন—নাথ! আপনি নিতান্ত অধীর ও দুর্ব্বলচিত্তের ন্যায় এ কি কথা কহিতেছেন! এ সময় আপনারও কি চৈতন্য লোপ হইল? প্রবল ঝটিকায় সামান্য তরুর ন্যায় মহাশৈলও যদি বিচলিত হয়, তবে ক্ষুদ্রে ও মহতে প্রভেদ কি? এ জগতে অসাধ্য-সাধনেই যদি সমর্থ না হইলেন, তবে নাথ! ভবাদৃশ মহাত্মার মাহাত্ম্য কোথায়? কোন্ পিতা মুমূর্ষু সন্তানকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করে? যেমন পতির প্রতি ভক্তি পত্নীর এক-মাত্র ব্রত, তেমনি প্রজার প্রতি অনুরাগ রাজার একমাত্র ব্রত। যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাকিবে, আমাদিগকে অটলভাবে সেই ব্রত পালন করিতে হইবে। আত্মহত্যা দ্বারা নিষ্কৃতিলাভ কাপুরুষের কার্য্য; যদি একান্তই তাহা করিতে হয়, তবে যতক্ষণ এ রাজ্যে

একটীও মহাপ্রাণীর প্রাণবায়ু অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিব। অবশেষে যখন তাহারও জীবনাশা নির্ব্বাণ হইবে, আমরা উভয়ে সেই শব-কঙ্কাল আলিঙ্গন করিয়া অনশনে জীবনব্রত উদ্‌যাপন করিব। এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার বদনজ্যোতিঃ দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হইল, নয়নদ্বার হইতে তেজঃপুঞ্জ বাহির হইতে লাগিল, মহিষী বজ্রনাদে বলিয়া উঠিলেন,—"হে ধর্ম্মবীর! উঠুন! উঠুন! হে প্রজাপাল! আর ভয় নাই। আমি যদি যথার্থ পতিসেবা করিয়া থাকি, যদি প্রজার দুঃখে আমার অন্তরাত্মা দ্রব হইয়া থাকে, আমি যদি সত্যের সাধনা ও ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকি, তবে কার সাধ্য আমার কথার অন্যথা করে; হে প্রজানাথ! আপনার প্রজাগণের আর দুর্ভিক্ষভয় নাই"। অহো! পতিব্রতার কি আশ্চর্য্য প্রভাব! ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্য করুণা! এ সংসারে ঘটনাচক্রের কি আশ্চর্য্য গতি! মহিষী ঈশ্বরে চিত্ত সমাহিত করিয়া সেই কথা বলিবামাত্র অকস্মাৎ শূন্যমার্গ হইতে ভূরি ভূরি মৃত কপোত পতিত হইতে লাগিল। রাজা আশ্চর্য্য মানিয়া মরণোদ্যম হইতে বিরত হইলেন। প্রজারা প্রত্যহ সেইরূপ মৃত কপোত ভোজন করিয়া প্রাণধারণ করিতে লাগিল, এবং কহিতে লাগিল,— জগদীশ্বর মহিষীর অলৌকিক ধর্ম্মনিষ্ঠায় প্রসন্ন হইয়া সকলের প্রাণরক্ষার এই অদ্ভুত উপায় বিধান করিলেন। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে পরমানন্দে জগৎপিতার অপার মহিমা এবং সেই পুণ্যবতী রাজ্ঞীর গুণাবলী গান করিতে লাগিল।

দিন দিন মহিষীর পুণ্যরাশি অজস্রধারায় বহিতে লাগিল. ঈশ্বরের কৃপায় আকাশমণ্ডলও ক্রমে সুপ্রসন্ন হইল। যথাকালে বসুন্ধরাও প্রচুর শস্যরত্ন প্রসব করিলেন।

ছত্রিশ বৎসর বয়সে প্রজাবৎসল মহারাজ তুগ্লীন পরলোক গমন করিলেন। পতিব্রতা বাক্‌পুষ্টা প্রজামণ্ডলীকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া পতির সহগমন করিলেন। সেই পুণ্যশীলা যে স্থানে মৃত পতির সহগমন করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি "বাক্‌পুষ্টাটবী" নামে পবিত্র তীর্থ বলিয়া খ্যাত রহিয়াছে।

চরিত্র।

পবিত্র চরিত্র ভবে অমূল্য রতন ;
চরিত্রের কাছে তুচ্ছ আছে যত ধন।
যাঁহার স্বভাবে নাহি হিংসালেশ আছে ;
ভয়ানক হিংস্রগণ শান্ত তাঁর আছে।
জলচর ভূচর খেচর আদি জীব ;
সবে বাধ্য তাঁর কাছে যিনি সদাশিব।
সাধুসহবাসে যদি করে অবস্থান ;
কুসুমকোমল হয় কঠিন পাষাণ।
অসুর দেবতা হয় সাধুসহবাসে ;
অঙ্গার আগুন হয় চরিত্র-পরশে।

সর্ব্বজীবে সদা যাঁর আপনার জ্ঞান ;
যথার্থ পবিত্র তিনি দেবতাসমান।
বিশ্বসেবা ব্রত যাঁর যিনি বিশ্বদাস ;
ভীতের অভয় যিনি আর্ত্তের আশ্বাস ;
তিনিই প্রকৃত সাধু এই ধরাতলে ;
তাঁহারে আদর্শ করি চলিবে সকলে।
এ ভবে চরিত্রশিক্ষা সর্ব্ব-শিক্ষা-সার ;
চরিত্রের পূজা করে সকল সংসার।
ভারতের ইতিহাস দেখ একবার ;
এমন শিক্ষার স্থান কোথা পাবে আর।
সত্যবীর, দয়াবীর, দানবীর, ধীর,
হরিশ্চন্দ্র, শিবি, রঘু, রাম, যুধিষ্ঠির।
ভীষ্ম, কর্ণ, ধনঞ্জয়, সুভদ্রানন্দন ;
জনক, প্রহ্লাদ, ধ্রুব, জীমূতবাহন।
শুকদেব, ব্যাস, বুদ্ধ, চৈতন্য, শঙ্কর ;
চরিত্রগৌরবে সবে জগতে অমর।
লোপামুদ্রা, অনসূয়া, গার্গী, অরুন্ধতী ;
মৈত্রেয়ী, সাবিত্রী, শৈব্যা, সীতা, লীলাবতী।
এ হেন চরিত্র কত তারাপুঞ্জ মত,
জ্বলিতেছে ভারত-আকাশে শত শত।
এ সব দৃষ্টান্ত হেরি চক্ষের উপর ;
অনন্ত উন্নতিপথে হও অগ্রসর।

জগতের আশা তুমি ভারত-কুমার ;
বিশ্বের আচার্য্যপদ পৈতৃক তোমার।
ত্রৈলোক্যপূজিত সেই পিতৃপদ ছাড়ি,
জন্মিয়া দেবতাকুলে না হইও হাড়ি।
দুর্জ্জয় ইন্দ্রিয় শত্রু বড়ই ভীষণ ;
পাপপথে সদাই দেখায় প্রলোভন।
সেই প্রলোভনে যদি ভুল একবার ;
নিশ্চয় পতন তবে ঘটিবে তোমার।
ধরিতে 'মনুষ্য' নাম যদি ইচ্ছা হয় ;
যতনে ইন্দ্রিয়গণে আগে কর জয়।
স্নেহ দয়া দিয়াছেন হৃদয়ে ঈশ্বর ;
তাই বাঁচিতেছে এই বিশ্ব চরাচর।
স্নেহ দয়া এ জগতে যদি না থাকিত ;
সৃষ্টি স্থিতি রসাতলে সকলি যাইত।
সৃষ্টিমাঝে শ্রেষ্ঠ জীব তুমি হে মানব !
স্নেহ দয়া ছাড়িয়া না হইও দানব।
প্রীতিভরে অকাতরে দীনে কর দান ;
কি আছে ভুবনে পুণ্য দানের সমান।
দয়া করি যদি দেও সর্ষপপ্রমাণ ;
তথাপি সে দানে পুণ্য পর্ব্বত সমান।
দানের প্রমাণে কিছু নাহি আসে যায় ;
যা দিবে পবিত্র মনে তাহাই অক্ষয়।

দান করি যে জন কিনিতে চায় মান ;
তাহার সে দান নয়, শুধু অভিমান।
অভিমান কেবল পাপের হয় মূল ;
পাপেই পতন হয় ইথে নাহি ভুল।
হৃদয়ের প্রেম সর্ব্ব সুখের আকর ;
প্রেমভরে দেখ যাহা তাহাই সুন্দর।
প্রেমময় সদা রয় যাঁহার হৃদয় ;
এ সংসার তাঁর কাছে সদা মধুময়।
না থাকিলে হৃদয়ে পবিত্র প্রেম-মধু ;
শোভাময় বিশ্ব হয় শূন্যময় শুধু।

সীতা-চরিত্র।

সীতা রাজর্ষি জনকের কন্যা ও রাজাধিরাজ রামচন্দ্রের মহিষী ছিলেন। এই দিব্যস্বভাবা নারী যে গুণে পৃথিবীর নরনারীকুলের আদর্শ-চরিত্র হইয়াছেন, সেই গুণের নাম সদ্ভাব। এক্ষণে সদ্ভাব কাহাকে বলে শুন। আমরা সকলেই এক প্রেমময় ঈশ্বরের সন্তান, আমাদের সকলের হৃদয় এক প্রেমময় সূত্রে গ্রথিত ; এইরূপ জ্ঞানকে সদ্ভাব বলে। এই সদ্ভাব হইতে মৈত্রী জন্মে। এ জগতে সকলেই আমার আপনার, এইরূপ জ্ঞানের নাম মৈত্রী। এই মৈত্রী হইতে অক্ষয় মহা-শক্তি উৎপন্ন হয়। লোক সেই মহাশক্তির বলে বলীয়ান্

হইলে প্রলয়েও তাহাব বিলয় নাই। সীতা সেই সত্ত্বাবগুণে গুণবতী ছিলেন, অর্থাৎ তিনি সকলকেই আপনার বলিয়া জানিতেন। তিনি পবিত্র চরিত্রের আদর্শরূপে ধ্রুবতারার ন্যায় অনন্তকাল জগতে জাজ্বল্যমান থাকিবেন।

তাঁহার পতি পিতৃসত্যপালনার্থে সর্ব্বত্যাগী ও বনবাসী হইলে, তিনিও সর্ব্বত্যাগিনী ও বনবাসিনী হইলেন, এবং ছায়ার ন্যায় পতির অনুগামিনী হইলেন। পথে অগ্নিময় নিদাঘ-সূর্য্য তাঁহার মস্তক দগ্ধ করিলে তিনি অম্লানমুখে তাহা সহ্য করিতেন, সুতীক্ষ্ণ কণ্টক বা কঠোর প্রস্তর বজ্রবৎ তাঁহার পদে বিদ্ধ হইলে, তিনি অবলীলায় তাহা সহ্য করিতেন। তিনি ক্ষুধা তৃষ্ণা অঙ্গের আভরণ করিয়াছিলেন। এই জন্যই বোধ হয়, তাঁহাকে 'সর্ব্বসংহা-নন্দিনী' বলিয়া থাকে। যিনি সকলই সহ্য করেন, সেই সর্ব্বজননী ধরণীর নাম 'সর্ব্বসংহা'; তাঁহার 'নন্দিনী' অর্থাৎ আনন্দময়ী কন্যা। সীতা সত্যই পৃথিবীর আনন্দময়ী কন্যা ছিলেন, তিনি পরমানন্দে সকলি সহ্য করিতেন।

সীতা একদিন দুর্গম কান্তারে পতির অনুগমন করিতে করিতে বলিয়াছিলেন,—আমার শ্বশুর-কুলপতি সূর্য্যদেব খরতর করে মস্তক দগ্ধ করিতেছেন; আমার মাতা ধরণী যেন কণ্টক-ময়ী হইয়াছেন, আমার প্রতি দয়ালেশ প্রকাশ করিতেছেন না; আমার প্রাণেশ্বরও ক্ষণকাল বিলম্ব সহিতেছেন না; জানিলাম অদৃষ্ট প্রতিকূল হইলে প্রাণের আত্মীয়ও প্রতিকূল হয়। অবস্থাচক্রের পরিবর্ত্তনে মনুষ্য হইতে রাক্ষস পর্য্যন্ত সকলেই

সীতার প্রতিকূল। গৃহে শ্বশুর শাশুড়ীর প্রতিকূলতায় তিনি বনবাসিনী; বনে রাক্ষসের প্রতিকূলতায় তিনি পতিবিরহিণী ও অশেষযন্ত্রণা-ভাগিনী; অবশেষে পতির প্রতিকূলতায় তিনি, সকল দিক্ জাজ্বল্যমান থাকিতেও পথের কাঙ্গালিনী হইয়াছিলেন। জীবনের এরূপ কঠিন পরীক্ষায় কি কেহ কখনও পড়িয়াছেন, না পড়িবেন? কিন্তু তিনি অলৌকিক পবিত্রতার বলে সেই দুস্তর পরীক্ষা-সাগর অবহেলে উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছেন। সকলে তাঁহার প্রতিকূল হইলেও তিনি কখনও কাহারও প্রতি প্রতিকূল হন নাই; তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে সকলেরি মঙ্গল কামনা করিয়াছেন। সকল অবস্থায় সকলের প্রতি সদাই অনুকূল ছিলেন। তিনি প্রবাসিত পতির সঙ্গে সঙ্গে এক বন হইতে অন্য বনে গমন করিলে, এক বনের পশু-পক্ষীরা তাঁহাকে না দেখিয়া আহার পরিহার করিয়া হাহাকার করিত, এবং অন্য বনের পশুপক্ষীরা তাঁহাকে দেখিয়া, শিশু যেমন অনেকক্ষণের পর মাতাকে পাইয়া আনন্দ করে, সেইরূপ আনন্দ করিত। তিনি যখন যে স্থানে যাইতেন, তাহা তখনি আনন্দকানন হইত এবং যে স্থান পরিত্যাগ করিতেন, তাহা শ্মশানবৎ শোচনীয় হইত।

সীতার মনে শত্রু মিত্র বা বড় ছোট ভেদ ছিল না; তিনি সকলেরি ব্যথায় ব্যথিত হইতেন। একটী কৃমিকীটেরও কষ্ট দেখিলে দয়ায় তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত হইত। তাঁহার সতীত্বের এরূপ প্রভাব ছিল যে তাদৃশ দুরাত্মা রাবণও সেই তেজোময়

সতীত্বের নিকট সুদূরপরাহত হইয়াছিল। সীতার হৃদয় অপার প্রেমের আধার ছিল। অশোকবনে রাবণের আদেশে তাঁহার প্রতি যে সকল যাতনা প্রযুক্ত হইযাছিল, যে সকল যাতনার আঘাতে পর্ব্বতও চূর্ণ হয়, সে সকল ভীষণ যাতনাকে তিনি কোমল কমলমালার ন্যায় হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি বিভীষিকামযী লঙ্কায় যে ভয়ঙ্করী রাক্ষসীব বৃন্দে পরিবেষ্টিত ছিলেন, সেই রাক্ষসীরাও শেষে তাঁহার গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার পদে বিকাইল। তিনি সেই ভীষণ রাক্ষসপুরে বাস করিয়া বিষেব মধ্যে অমৃত লাভ করিলেন। অতএব ইহা নিশ্চয় জানিও যে, সদ্ভাবের কোথাও শত্রু নাই, সদ্ভাবের রাজ্যে সকলেই মিত্র। মহাদেব যেরূপ কালসর্প লইয়া হৃদয়ের আভরণ করেন, সদ্ভাবময়ী সীতাও সেইরূপ ভয়ঙ্কর শত্রুকে হৃদয়ের আভরণ করিতেন। "শীলেন সর্ব্বে বশাঃ"—চরিত্রে সকলেই বশীভূত হয়, তিনি এই সত্যটী জীবনের প্রত্যেক অবস্থায় সপ্রমাণ করিয়াছেন।

সীতা পতিপ্রাণা ছিলেন; মাতা, পিতা, শ্বশুর, শাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনের প্রতি ভক্তিমতী ছিলেন; ভ্রাতা, ভগিনী, দেবর ও ননন্দা প্রভৃতির প্রতি প্রেমময়ী ছিলেন; সন্তান ও দাস দাসী প্রভৃতি প্রতিপাল্যের প্রতি স্নেহময়ী ছিলেন। প্রাণিমাত্রেরি প্রতি মৈত্রীময়ী ছিলেন; দুঃখিতের প্রতি দয়াময়ী ছিলেন। তিনি সার্ব্বভৌম রাজার মহিষীপদে অভিষিক্ত হইয়া স্বহস্তে অন্নব্যঞ্জন পাক করিয়া পরিজনগণকে ভোজন করাই-

তেন। রামচন্দ্র অলীক লোকাপবাদে ক্ষুভিত হইয়া, বিনা দোষে সেই পূর্ণগর্ভা ধর্ম্মপত্নীকে পরিত্যাগ করিলে, সেই পতিব্রতার বদন হইতে পতির প্রতি একটীও অপ্রিয় বাক্য নির্গত হয় নাই, তিনি আপনাকেই দুষ্কৃতিনী ও চিরদুঃখভাগিনী জানিয়া, বারংবার আত্মনিন্দা করিয়াছিলেন এবং জন্মান্তরে রামকেই পতিরূপে লাভ করিবার জন্য কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। পৃথ্বীশ্বরপত্নী যে সীতা পূর্ব্বরাত্রে কৈলাসসদৃশ প্রদীপ্ত রাজপ্রাসাদে শিবতুল্য পতির পার্শ্বে বিরাজ করিয়াছিলেন, পর দিনে সেই সীতা শরণার্থিনী হইয়া দরিদ্র বাল্মীকির পর্ণকুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সমাগমে তত্রত্য অরণ্যবাসী ও অরণ্যবাসিনীর মুখমণ্ডলে অপূর্ব্ব আনন্দজ্যোতি প্রকাশিত হইল। তিনি বাল্মীকির কুটীরে বাস করিয়া সেই শান্তিময় পবিত্র আশ্রমের অধিষ্ঠাত্রীর ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন, তথায় সর্ব্বপ্রাণীর জননীরূপে অধিষ্ঠান করিতে লাগিলেন। তিনি যখন সেচনকুম্ভ লইয়া সস্নেহে আশ্রমের চারা গাছগুলিতে জল দিতেন, তখন তিনি অপত্যপ্রসবের পূর্ব্বেই অপত্যপালনের আনন্দ অনুভব করিতেন। তিনি যখন প্রত্যূষে তমসার জলে অবগাহন করিয়া পুলিনে ইষ্টদেবতার উদ্দেশে পূজা করিতেন, তখন যুগপৎ ঈশ্বরসেবা ও পতিসেবার সুখ অনুভব করিয়া অপূর্ব্ব আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেন। তিনি বাল্মীকির সেই পুণ্যক্ষেত্রে নিত্য অতিথি ও অভ্যাগতের জন্য মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া দুঃসহ পতিবিরহবেদনা বিস্মৃত হইতেন। তিনি জলে

স্নান করিতে নামিলে জলচর পক্ষীরা তাঁহাকে বেড়িয়া আনন্দে রব করিত। তিনি ভিক্ষুককে অন্ন দিতে যাইলে পশুকুল তাঁহার হস্তের ভোজনপাত্র কাড়িয়া লইত। তিনি যজ্ঞিয় কুশ কাশ ও ফল ফুল আহরণ করিলে তপোবন-মৃগেরা তাহা হরণ করিত। তিনি অতিথিসেবার জন্য নীবার চয়ন করিলে গগনচর পক্ষীরা আসিয়া তাঁহার স্কন্ধে ও হস্তে বসিয়া তাহা আত্মসাৎ করিত। তিনি করতালি প্রদান করিলে বনের মাতঙ্গ, কুরঙ্গ, বিহঙ্গ ও পতঙ্গ তাঁহাকে বেড়িয়া নৃত্য করিত। বনের তরু, লতা, শিলা ও শৈবলিনীর মধ্যে কেহ তাঁহার ভাই, কেহ ভগিনী, কেহ সখা, কেহ সখী, কেহ পুত্র, কেহ বা কন্যা ছিল। এইরূপ জল, স্থল ও আকাশ সকলি সীতার বন্ধুময়; চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ্ সকলি সীতার বন্ধুময়।

যেরূপে সীতার ভৌতিক দেহের অবসান হয় তাহা ভাবিলে তাঁহাকে দেবতা ভিন্ন আর কিছুই বলিতে ইচ্ছা হয় না। রামচন্দ্র পতিপ্রাণা পত্নীকে বিসর্জ্জন করিয়া গোপনে নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেন। রামচন্দ্র রাজা; প্রজারঞ্জনই রাজার সর্ব্বোপরি ধর্ম্ম; এজন্য তিনি প্রজার বিরক্তিভয়ে ধর্ম্মপত্নীকে গৃহ হইতেই অন্তর করিয়াছিলেন, তাঁহাকে হৃদয় হইতে অন্তর করেন নাই। ধীমান্ রামচন্দ্র সেই নিদারুণ সীতাশোক হৃদয়ে সম্বরণ করিয়া, সর্ব্বপ্রযত্নে প্রজাগণকে সুখী করিতে লাগিলেন। তিনি স্বয়ং নির্লোভ ছিলেন, এজন্য প্রজারা সমৃদ্ধিশালী হইল; তিনি বিঘ্নভয় নিবারণ করিতেন, এজন্য প্রজারা ক্রিয়াবান্

হইল; তিনি পালনগুণে সকলের পিতা, এবং শোক শান্তি করিয়া সকলের পুত্র হইয়াছিলেন। তিনি এইরূপে অসংখ্য প্রজাপুঞ্জের সুখসৌভাগ্যসাধনে নিবিষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া অবধি আর কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না। তিনি শোকশান্তির জন্য স্বর্ণময়ী সীতা নির্ম্মাণ করিয়া মহাযজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন। রামের যজ্ঞে ত্রিলোকীর সমস্ত সাধুগণের সমাগম হইল; মহাসমারোহে অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ হইল। এদিকে মহর্ষি বাল্মীকি সীতার দুইটী অমৃতকণ্ঠ শিশুকে সঙ্গে লইয়া যজ্ঞসভায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অজ্ঞায় কুশ লব তথায় রামায়ণ গান করিতে লাগিলেন। একে রামের চরিত; তাহাতে বাল্মীকি তাহার কবি, তাহাতে আবার কিন্নরকণ্ঠ কুশ লব তাহার গায়ক; সমবেত লোকসকল একাগ্রচিত্তে কুশ লবের সংগীতশ্রবণে নিমগ্ন হইল, সকল নেত্র হইতেই অশ্রুবারি গড়াইতে লাগিল, বোধ হইল যেন একটী বিশাল অরণ্যভূমি প্রভাতে নির্বাত ও নিস্পন্দ হইয়া আছে, আর তাহার পত্রে পত্রে শিশির ঝরিতেছে।

অনন্তর, রামচন্দ্র মহর্ষি বাল্মীকির নিকট গমন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন,—পিতঃ! এ শিশু দুইটী কাহার? ইহারা দেখিতেছি অবিকল আমারি প্রতিরূপ, প্রভেদ কেবল বয়সে ও বেশে। ইহাদিগকে দেখিয়া স্নেহে আমার অন্তরাত্মা দ্রবীভূত হইতেছে। তখন পরম কারুণিক বাল্মীকি কুশ লবের পরিচয় দিয়া কহিলেন,—বৎস! তোমার পবিত্রতাময়ী

ধর্ম্মপত্নীকে পুনরায় গ্রহণ কর, তোমার এই হৃদয়সর্ব্বস্ব তনয় দুইটীকে ক্রোড়ে কর, আমাদের সকলের শোক-শল্য মোচন কর। রাম কহিলেন,—পিতঃ! আপনার পুত্রবধূকে আমি নিষ্কলঙ্কা বলিয়া জানি, কিন্তু দুর্বৃত্ত রাবণের গৃহে বাস করায় তাঁহার চরিত্রে অত্রত্য লোকের বিশ্বাস নাই। জানকী অগ্রে আত্মচরিত্রে প্রজাগণের বিশ্বাস উৎপাদন করুন, পরে আমি আপনার আজ্ঞায় তাঁহাকে গ্রহণ করিব। রাম এইরূপ কহিলে, মহর্ষি শিষ্য পাঠাইয়া তপোবন হইতে সীতাকে আনাইলেন। পরদিনে রাম সমস্ত পৌরগণকে আহ্বান করিলেন, বাল্মীকিও যথাকালে সীতা ও কুশ লবকে লইয়া সভায় উপস্থিত হইলেন। রক্তবস্ত্রে সীতার সর্ব্বশরীর আচ্ছাদিত, নিজপদে দৃষ্টি সংলগ্ন; মূর্ত্তি প্রশান্ত পবিত্র অথচ তেজোময়; বোধ হইল, সেই সভাঙ্গনে অরুণোদয় হইয়াছে। মহর্ষি আসন পরিগ্রহ করিয়া সীতাকে আদেশ করিলেন,—বৎসে! তুমি তোমার পতির সমক্ষে আপন চরিত্রবিষয়ে লোকের সংশয় নিরাকৃত কর। তখন সীতার নয়নদ্বয় পতির পাদপদ্মে নিবদ্ধ। তিনি পবিত্র জলে আচমন করিয়া সর্ব্বসমক্ষে এই বাণী উচ্চারণ করিলেন,—"যদি আমি কায়মনোবাক্যে পতি হইতে বিচলিত না হইয়া থাকি, তবে মা বসুন্ধরে! আমাকে তোমার গর্ভে অন্তর্হিত কর।" পরক্ষণেই জীবলোকে হাহাকার উঠিল, দৃষ্ট হইল, সীতা জীবলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।

এইরূপে জনককুলের ও রঘুকুলের মঙ্গলপ্রদীপ নির্ব্বাণ

হইল। নির্ব্বাণ হইল বটে, কিন্তু যতকাল জগতে চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে, ততকাল 'সীতা' এই পবিত্র অক্ষর দুইটী মঙ্গল-চরিত্রের আদর্শকে বুঝাইবে। সীতা পবিত্র দেবযজ্ঞে জন্মিয়াছিলেন; পবিত্র দেবযজ্ঞ করিয়াই চলিয়া গেলেন। বিশ্বপূজিতা বশিষ্ঠ-পত্নী অরুন্ধতী সীতাকে উদ্দেশ করিয়া সত্যই বলিয়াছিলেন,— "বৎসে! তুমি শিশুই হও, আর আমার শিষ্যাই হও, তোমাতে যে অলৌকিক পবিত্রতা আছে, তাহাতে তোমার প্রতি আমার প্রগাঢ় ভক্তির উদ্রেক হয়। জগতে, কেহ তোমার বয়স, জাতি বা সম্বন্ধ ভাবিয়া পূজা করিবে না, তোমার গুণ ভাবিয়াই চিরকাল তোমার পূজা করিবে"।

দুর্গাতিতরণ। (১)

১। যাঁহারা কটু কথার কটু উত্তর করেন না; হিংসার প্রতিহিংসা করেন না; উপকারের প্রত্যুপকার চাহেন না; তাঁহারা দুর্গ অতিতরণ করেন।

২। যাঁহারা নিত্য অতিথিসেবায় নিযুক্ত; সর্ব্বত্র সদ্ভাব-সম্পন্ন; সদাই সৎসঙ্গে ও সৎপ্রসঙ্গে অনুরক্ত; তাঁহারা দুর্গ অতিতরণ করেন।

---

(১) দুর্গ—দুর্গম স্থান, সঙ্কট, অর্থাৎ সংসারের শোক-দুঃখ; তাহার অতিতরণ অর্থাৎ অতিক্রম; মনুষ্য যেরূপ হইলে সমস্ত দুর্গতি হইতে নিস্তার পায় তাহার বিষয়।

৩। যাঁহারা কার্য্যে মনে ও বাক্যে নিষ্পাপ; সর্ব্বভূতের বিশ্বাসস্থান; সকলের আশ্বাসস্থান; তাঁহারা দুর্গ অতিতরণ করেন।

৪। যাঁহারা প্রাণান্তেও সত্য হইতে অবিচলিত; সকলের শুভাকাঙ্ক্ষী; শত্রু-মিত্রে সমদৃষ্টি; তাঁহারা দুর্গ অতিতরণ করেন।

৫। যাঁহাদের নিকট কাহারও ভয় নাই; কাহারও নিকট যাঁহাদের ভয় নাই; যাঁহারা নিজের ক্রোধ সম্বরণ ও পরের ক্রোধ শান্তি করেন, তাঁহারা দুর্গ অতিতরণ করেন।

৬। যাঁহারা পরশ্রীদর্শনে পুলকিত, পরদুঃখদর্শনে দুঃখিত; অশ্লীল ও অসভ্য বিষয়ে পরাঙ্মুখ; তাঁহারা দুর্গ অতিতরণ করেন।

৭। যাঁহারা গুরুজনমাত্রেরি পূজা করেন; সদুপদেশ-মাত্রই গ্রহণ করেন; সৎকর্ম্মমাত্রই আদর করেন; তাঁহারা দুর্গ অতিতরণ করেন।

৮। যাঁহারা নিজগুণের অভিমান করেন না, পরগুণের সম্মান করেন; আত্মাপরাধে অনুতাপ ও পরাপরাধ ক্ষমা করেন; নিজ দুঃখ সহ্য করেন, পরদুঃখ দূর করেন; তাঁহারা দুর্গ অতিতরণ করেন।

৯। যাঁহারা দিবানিদ্রা ও রাত্রিজাগরণ, আহার্য্যলোভ ও মাদকসেবন, পরনিন্দা ও পরাপকার বিষবৎ পরিহার করেন; তাঁহারা দুর্গ অতিতরণ করেন।

১০। যাঁহাদের ধর্ম্মে বিশ্বাস, হৃদয়ে আশ্বাস, বদনে বিকাশ ও বচনে উল্লাস; তাঁহারা দুর্গ অতিতরণ করেন।

১১। যাঁহাদের ঈশ্বরে আনন্দজ্ঞান ও মাতাপিতায় ঈশ্বর-জ্ঞান; সোদরে আত্মজ্ঞান, অপরে সোদরজ্ঞান; তাঁহারা দুর্গ অতিতরণ করেন।

স্বদেশ।

জান না কি জীব! তুমি জননী জনমভূমি
যে তোমায় হৃদয়ে রেখেছে;
থাকিয়া মায়ের কোলে সন্তানে জননী ভোলে
কে কোথায় এমন দেখেছে?
ভূমিতে করিয়া বাস ঘুমেতে পূরাও আশ
জাগিলে না দিবা বিভাবরী;
কত কাল হরিয়াছ এই ধরা ধরিয়াছ
জননী-জঠর পরিহরি।
যার বলে বলিতেছ যার বলে চলিতেছ
যার বলে চালিতেছ দেহ;
যার বলে তুমি বলী তার বলে আমি বলি
ভক্তিভাবে কর তারে স্নেহ।
প্রসূতি তোমার যেই তাঁহার প্রসূতি এই
বসুমতী মাতা সবাকার;
কে বুঝে ক্ষিতির রীতি তোমার জননী ক্ষিতি
জনকের জননী তোমার।

কত শস্য ফল মূল   না হয় যাহার মূল
হীরকাদি রজত কাঞ্চন;
বাঁচাতে জীবের অস্থ   বক্ষেতে বিপুল বস্থ
বসুমতী করেন ধারণ।
প্রকৃতির পূজা ধর   পুলকে প্রণাম কর
প্রেমময়ী পৃথিবীর পদে;
বিশেষতঃ নিজ দেশে   প্রীতি রাখ সবিশেষে
মুগ্ধ জীব যার প্রেমমদে।
ইন্দ্রের অমরাবতী   ভোগেতে না হয় মতি
স্বর্গভোগ উপসর্গ স্মার;
শিবের কৈলাসধাম   শিবপূর্ণ বটে নাম
শিবধাম স্বদেশ তোমার।
মিছা মণি মুক্তা হেম   স্বদেশের প্রিয় প্রেম
তার চেয়ে রত্ন নাই আর;
সুধাকরে কত সুধা   দূর করে তৃষ্ণা ক্ষুধা
স্বদেশের শুভ সমাচার।
মাতৃভাব ভাবি মনে   দেখ দেশবাসিগণে
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া;
বৃদ্ধি কর মাতৃভাষা   পূরাও দেশের আশা
জননীর সুপুত্র হইয়া।

লব ও চন্দ্রকেতু।

সীতা বাল্মীকির আশ্রমে যমজ পুত্র প্রসব করেন। প্রথমটীর নাম কুশ, এবং দ্বিতীয়টীর নাম লব। তাঁহারা তথায় বাল্মীকির পরম যত্নে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। উভয়েই একমূর্ত্তি একহৃদয় ও একপ্রাণ, কেহ কাহাকে এক দণ্ড না দেখিলে অস্থির হইতেন; আহার বিহার, অধ্যয়ন ও শয়ন সকলি একসঙ্গে করিতেন। বাল্মীকি যথাকালে তাঁহাদের শিক্ষাদানে নিযুক্ত হইলেন। কুশ ও লব আচার্য্যকেই পিতা বলিয়া জানিতেন; বাল্মীকির আজ্ঞায় তাঁহাদের পিতৃপরিচয় কেহ প্রকাশ করে নাই।

বার বৎসর বয়সেই তাঁহারা ধনুর্ব্বেদে সুশিক্ষিত হইলেন, সমস্ত রামায়ণ কাব্য কণ্ঠস্থ করিলেন। তাঁহারা দিবাভাগে, শাস্ত্রাভ্যাস, শস্ত্রচালনা, বৃক্ষরোপণ, ফল পুষ্প কুশ কাশ ও কাষ্ঠ প্রভৃতির আহরণ, ইত্যাদি বিবিধ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন; অবসরকালে সমবয়স্ক মুনিবালকদিগের সহিত ক্রীড়া করিতেন। সহচর বালকেরা তাঁহাদিগকে প্রাণের তুল্য ভালবাসিত, সকল কার্য্যেই তাঁহাদিগকে প্রধান করিত, এবং সর্ব্বদাই তাঁহাদের আজ্ঞাবহ থাকিত। বনের পশুপক্ষীরাও তাঁহাদিগকে দেখিলে পুলকিত হইত; তাঁহাদের অবস্থানে সমস্ত বন যেন নিত্য উৎসবময় বোধ হইত। সেই দুই ভুবনমোহন শিশু প্রতিদিন সন্ধ্যার পর জননীর কাছে বসিয়া মধুরস্বরে সুললিত রামচরিত

গান করিতেন। তপোবনের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়া সেই গান শুনিত, বনের পশুরাও নিস্পন্দ হইয়া থাকিত।

একদা গুরুর কোন কার্য্যোপলক্ষে কুশ স্থানান্তরে গিয়াছিলেন, লব সহচর বালকদিগের সহিত আশ্রমের প্রান্তে ক্রীড়া করিতেছেন, এমন সময় কয়েকটী বালক দ্রুতপদে আসিয়া কহিল,—শীঘ্র আইস, শীঘ্র আইস, আমরা পশুশাস্ত্রে যে অশ্বের কথা পড়িয়াছি, তাহা দেখিবে ত শীঘ্র চল, সে এতক্ষণ অনেক দূর চলিয়া গেল। এই কথা শুনিয়া সকল বালক দৌড়িল, লব সকলের অগ্রে দৌড়িতে লাগিল, মুহূর্ত্তমধ্যে সকলেই অশ্বের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল।

বালকগণ। (লবের প্রতি) কুমার! দেখ দেখ! কেমন আশ্চর্য্য জন্তু! আচ্ছা, ইহার সঙ্গে এত লোকজন আসিয়াছে কেন?

লব। এ নিশ্চয় অশ্বমেধের অশ্ব।

বালকগণ। কিরূপে জানিলে?

লব। তোমরা কি অশ্বমেধের প্রকরণে পড় নাই যে শত শত শস্ত্রধারী পুরুষ অশ্বের রক্ষায় নিযুক্ত হয়। যদি আমার কথায় না প্রত্যয় হয়; গিয়া জিজ্ঞাসা কর।

বালকগণ। ওহে সৈনিকগণ! এই অশ্ব কি জন্য ভ্রমণ করিতেছে? ইহার সঙ্গে এত লোকজন কেন?

সৈনিকগণ। (উচ্চৈঃস্বরে) ত্রিভুবনে যিনি অদ্বিতীয় বীর,

সেই রাজাধিরাজ রামচন্দ্রের এই অশ্ব ও এই জয়পতাকা ; জগতে যদি কেহ বীর থাকে, আসিয়া এই অশ্ব ও পতাকা রোধ করুক।

লব। উঃ! কি স্পর্দ্ধার কথা ? ওরে! তবে কি জগতে আর বীর নাই ? এ যে সমস্ত বীরের মস্তকে পদাঘাত!

সৈনিকগণ। আমাদের মহারাজের কাছে আবার বীর কে ?

লব। দূর মূর্খ! তবে কি বীরধর্ম্মে তাঁহারি অধিকার ? অথবা জগতে আর বীর থাকুক বা নাই থাকুক, তোমাদের এরূপ বিভীষিকায় আমি ভীত নহি ; এই দেখ! আমি তোমাদের অশ্ব ও পতাকা হরণ করিতেছি। (সহচরগণের প্রতি) ভাই! তোমরা এই অশ্বটাকে ঢেলা মারিতে মারিতে লইয়া যাও, বেচারা আশ্রমে গিয়া মৃগগণের সঙ্গে বিচরণ করুক।

অনন্তর, একজন দর্পপূর্ণ ভীষণমূর্ত্তি সৈনিক লবের সম্মুখীন হইয়া কহিল,—তোর চপলতায় ধিক্! কি বলিতেছিলি ? জানিস না যে প্রচণ্ড নিষ্ঠুর সৈনিকেরা শিশুরও স্পর্দ্ধাবাক্য ক্ষমা করে না। আমাদের রাজকুমার চন্দ্রকেতু এখনও পশ্চাতে আছেন, তিনি না আসিতে আসিতে এই বেলা পলায়ন কর্।

বালকগণ। ভাই! আমাদের অশ্বে কাজ নাই ; ঐ দেখ! শস্ত্রধারী পুরুষেরা তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে, আশ্রমও অনেক দূর, শীঘ্র আইস! আমরা হরিণের ন্যায় লম্ফ দিয়া পলায়ন করি। এই বলিয়া সকলে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

লব। আঁ! আমার কাছে আবার অস্ত্রের আস্ফালন! এই বলিয়া ধনুকে টঙ্কার দিয়া, সিংহশিশু যেমন মহাবেগে মৃগযূথের

উপর পতিত হয়; তেমনি সেই বীরশিশু সৈন্যসাগরমধ্যে ঝম্প দিলেন। ক্ষণকালমধ্যেই সৈন্যমধ্যে মহামারি পড়িয়া গেল।

লক্ষ্মণের পুত্র কুমার চন্দ্রকেতু সেই সৈন্যের নেতা ছিলেন। পথে মুনিজনের পূজায় ও বনশোভাদর্শনে বিলম্ব হওয়ায় তিনি এতক্ষণ যুদ্ধের সংবাদ জানিতেন না। লোকমুখে ঐ সংবাদ পঁহুছিবামাত্র, সারথি সুমন্ত্র অশ্বের পৃষ্ঠে কষাঘাত করিলেন, বেগে তাঁহার রথ গিয়া লবের সম্মুখে উপস্থিত হইল।

চন্দ্রকেতু লবের সমবয়স্ক এবং লবের ন্যায় মধুরদর্শন ছিলেন। সেই দুই রমণীয় বীরশিশু কিয়ৎক্ষণ নিশ্চলভাবে পরস্পরকে দেখিতে লাগিলেন; উভয়েরি মনে হইল যেন দৌড়িয়া গিয়া আলিঙ্গন করেন। অপূর্ব্ব ভ্রাতৃপ্রেমে উভয়েরি হৃদয় আর্দ্র হইল। পরস্পর মনে করিতে লাগিলেন,—কি আশ্চর্য্য! ইহাঁকে দেখিয়া আমার মন কেন আকুল হইতেছে? জ্ঞান হইতেছে যেন কত কালের বন্ধুকে পাইলাম। বুঝি জন্মান্তরে আমাদের কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, অথবা ইহজন্মেই কোন সম্বন্ধ আছে, দৈবঘটনায় তাহা জানিতে পারিতেছি না।

অনন্তর চন্দ্রকেতু রথ হইতে নামিয়া সৈন্যগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—ওহে যোধগণ! আপনারা অসংখ্য বীরপুরুষ মিলিত; আর এই শিশু একাকী। আপনারা কেহ রথে, কেহ দ্বিরদে, কেহ বা তুরগে আরোহণ করিয়াছেন; আর ইনি ভূমিপৃষ্ঠে অবস্থান করিছেন। অভেদ্য বর্ম্মে আপনাদের দেহ সুরক্ষিত; আর এক খণ্ড মৃগচর্ম্ম ইহাঁর আচ্ছাদন। আপনারা

বয়োধিক ; আর ইনি সুকুমার শিশু। ঈদৃশ প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত আপনাদের এই যুদ্ধে ধিক্!

লব। (চন্দ্রকেতুর প্রতি) কুমার! আমি একাকী বলিয়া কিছুমাত্র ভীত নহি; আপনার অনুকম্পাও চাহি না। ইহারা কেহই আমার প্রতিদ্বন্দ্বী নহে। আজি যদি আপনার ন্যায় বীরের সহিত যুদ্ধ করিতে পাই, আমার অস্ত্রশিক্ষা সার্থক হয়।

চন্দ্রকেতু। ওহে বীরকুমার! আমি আপনার অদ্ভুত বীর্য্য দেখিয়া প্রীত হইয়াছি, অতএব আপনি আমার সখা হইলেন। আপনাকে দেখিয়া আমার হৃদয় পুলকিত হইতেছে, কিন্তু আপনাকে যুদ্ধার্থী ভাবিয়া আমার বাহু বীররসে নৃত্য করিতেছে। আপনি কে? কি জন্যই বা কলহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন?

লব। (বিনীতভাবে) আমরা ভগবান্ বাল্মীকির শিষ্য।

চন্দ্রকেতু। 'আমরা' বলিলেন যে? আপনি কি এস্থানে একাকী নহেন?

লব। আমরা দুই যমজ ভ্রাতা। আমার অগ্রজ কুশ, গুরুদেবের কার্য্যে স্থানান্তরে গিয়াছেন। আমি সহচরগণের সহিত ক্রীড়া করিতেছিলাম, আপনার সৈনিকগণের অসহ্য স্পর্দ্ধার কথা শুনিয়া অশ্ব ও পতাকা হরণ করিয়াছি; নতুবা আমরা কাহারও শুভকর্ম্মের বিদ্বেষী নহি।

চন্দ্র। সৈনিকেরা কি বলিয়াছিল?

লব। উহারা সদর্পে কহিল,—"এই অশ্ব ও জয়পতাকা অদ্বিতীয় বীর মহারাজ রামচন্দ্রের, কাহারও বল থাকে, আসিয়া

বোধ করুক।” ভাল, আপনাকেই জিজ্ঞাসা করি, আমরা সেই পূজনীয় রাজর্ষিকে বিনয় ও সৌজন্যের আধার বলিয়া জানি। যাঁহার অমৃতময় চরিত্রে বিশ্বসংসার মুগ্ধ, তাঁহার লোকদিগের মুখে এরূপ অবিনয়ের বাক্য কেন? মহর্ষিরা বলিয়া থাকেন যে, অবিনয়ের বাক্য কেবল উন্মাত্তের মুখেই শোভা পায়। বিনয়ে মনের সদ্ভাব এবং অবিনয়ে মনের অসদ্ভাব প্রকাশ পায়। অসদ্ভাব সকল অনর্থের মূল। সূনৃত বচনে সমস্ত অভিলাষ সিদ্ধ হয়, অলক্ষ্মী তিরোহিত হয়, গৌরবের বৃদ্ধি হয়। এইজন্যই পণ্ডিতেরা সূনৃত বাণীকে নিখিল কল্যাণের জননী কামধেনু বলিয়া বর্ণনা করেন।

চন্দ্রকেতু। যিনি ত্রিলোকীপূজিত, আমাদের সেই পিতৃদেবের প্রাধান্যও কি আপনি মানেন না? বোধ হয়, আপনি রঘুবীরকে ভালরূপ জানেন না, জানিলে তাঁহার গৌরবে আক্রোশ হইত না। ওরে মূর্খ! ক্ষত্রিয়কুলের কালান্তক কাল সেই পরশুরামকে যিনি দমন করিয়াছেন, তাঁহার কাছে আবার বীর কে?

লব। (হাস্য করিয়া) পরশুরামকেও দমন করিয়াছেন, ইহাতে আর বীরত্ব কি? ব্রাহ্মণের বীর্য্য ত কেবল বচনেই, বাহুবীর্য্যে ক্ষত্রিয়েরি অধিকার; পরশুরাম ব্রাহ্মণ হইয়া শস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, অতএব তাঁহাকে জয় করায় আর তাঁহার প্রশংসা কি?

চন্দ্রকেতু। তবে আপনার কাছে ভগবান্ ভৃগুনন্দনও বীর নহেন। আর যিনি ত্রিলোকীর অভয়দাতা, আমাদের সেই

পিতৃদেবও বীর নহেন। আপনি দেখিতেছি অদ্ভুত বীরত্বের অবতার! আর অধিক বাড়াবাড়ি করিবেন না, ক্ষান্ত হউন।

লব। (সরোষে) আর বাগ্‌বিতণ্ডায় প্রয়োজন নাই। যদি অশ্ব ও পতাকা মোচন করিবার ইচ্ছা থাকে, শস্ত্র গ্রহণ করুন; আমাকে জয় না করিলে কৃতকার্য্য হইবেন না।

চন্দ্রকেতু। আপনার এই বীরোচিত সাহসে আনন্দিত হইলাম। তেজস্বী প্রাণান্তেও অন্যের তেজ সহ্য করেন না; সূর্য্যকান্তমণি সূর্য্যের তেজে অগ্নি উদ্গিরণ করে। অতএব আপনিই আমার যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী।

ক্রমে উভয়েরি ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল, মস্তকের শিখা কম্পিত হইতে লাগিল, নয়নযুগল রক্তপদ্মের শোভা ধারণ করিল, ভ্রূ বিঘূর্ণিত হইল; যুগপৎ উভয়েরি কোদণ্ড হইতে ঘোর টঙ্কারধ্বনি উত্থিত হইল। সারথি সুমন্ত্র কুমার চন্দ্র-কেতুকে তাদৃশ দুর্জ্জয় বীরের সহিত পাদচারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত দেখিয়া শঙ্কিত হইয়া কহিলেন,—কুমার! তুমি এই সুসজ্জিত রথে আরোহণ করিয়া উহার সহিত সাবধানে যুদ্ধ কর।

চন্দ্রকেতু। আর্য্য! আপনি এ কিরূপ আদেশ করিলেন? আমার প্রতিদ্বন্দ্বী পাদচারে, আর আমি রথে যুদ্ধ করিব। এ বীরপুরুষের ধর্ম্ম নয়। শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন,—পাদচার প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত কদাচ রথারোহণে যুদ্ধ করিবে না। অতএব যাহাতে বীরাচার পালন হয় এবং ইহাঁর সম্মানও রক্ষা হয় তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য।

সুমন্ত্র। (মনে মনে) আমি বিষম সঙ্কটে পড়িলাম; এক্ষণে কিরূপে এই ধর্ম্মসঙ্গত কার্য্যের নিষেধ করি, কিরূপেই বা এরূপ দুঃসাহসের কার্য্যে কুমারকে অনুমতি করি।

চন্দ্রকেতু। আর্য্য! কোন গুরুতর কর্ত্তব্যের সংশয় উপস্থিত হইলে যখন পিতারাও আপনাকে জিজ্ঞাসা করেন, তখন আপনি এ সামান্য বিষয়ে ভাবিতেছেন কি?

সুমন্ত্র। কুমার! তুমি ন্যায্য কথাই বলিয়াছ; পাদচারের সহিত পাদচারেই যুদ্ধ করিতে হয়, এবং এই সকল বীরাচার প্রতিপালন করাই তোমাদের কুলব্রত। ধন্য তুমি মহাত্মা লক্ষ্মণের পুত্র! সার্থক তোমার মাতা তোমায় গর্ভে ধারণ করিয়াছেন।

অনন্তর সেই দুই বীরশিশু পরস্পর ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয়ের শরাসন হইতে অজস্র ধারায় শস্ত্রবৃষ্টি হইতে লাগিল; মুহূর্ত্তমধ্যে দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইল। উভয়েরি তুল্য শিক্ষা, তুল্য বীর্য্য ও তুল্য সাহস; কাহারও শ্রান্তি নাই, বিরাম নাই। সমস্ত সৈন্য চমকিত হইয়া সেই যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিল। সকলেই দেখিল যে,—তাঁহারা উভয়ে জিগীষা ও বীর্য্যমদে মত্ত হইয়াও যুদ্ধে অণুমাত্র ন্যায়সীমা অতিক্রম করিতেছেন না; জয়লাভের ইচ্ছা, প্রাণসংহারের ইচ্ছা নাই; যেন প্রকৃত বীরধর্ম্ম ঐ দুই শিশুরূপে অবতীর্ণ।

যখন লব ও চন্দ্রকেতুর ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছিল, তখন মহারাজ রামচন্দ্র অনতিদূরে এক আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন।

তিনি সেই শিশু-যুদ্ধের বার্ত্তা শ্রবণমাত্র দিব্যরথে তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং উভয় শিশুর মধ্যস্থানে রথ থামাইয়া জলদ-গম্ভীরস্বরে কহিলেন,—'বৎস ! তোমরা যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত হও'। গুরুজনের আদেশ শ্রবণমাত্র চন্দ্রকেতু অস্ত্র ত্যাগ করিয়া উঠিলেন, লবও শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। অনন্তর সেই কমনীয় কুমারযুগল পরম সদ্ভাবে পরস্পরের হস্ত ধারণ করিয়া বিনীতভাবে রামচন্দ্রের চরণে গিয়া প্রণত হইলেন।

অভিমন্যু।

চক্রব্যূহ করি দ্রোণ করে মহারণ;
সে ব্যূহ ভেদিবে নাহি হেন কোন জন।
ব্যূহমুখে জয়দ্রথ কালান্তক প্রায়;
সংহারিছে পাণ্ডবের সৈন্য সমুদায়।
তাহার পশ্চাতে রহে দ্রোণ মহাশয়;
দুইপার্শ্বে অশ্বত্থামা সূর্য্যের তনয়।
স্থানে স্থানে রাখে দ্রোণ মহাবীরগণ;
ব্যূহমধ্যে ভ্রাতৃসহ রাজা দুর্য্যোধন।
পশ্চাতে রহিল কৃপ শল্য ভগদত্ত;
সবে মহাপরাক্রমী রণে মহামত্ত।
দেবের অজিত ব্যূহ সৈন্যসমাবেশ;
সাহস না হয় কারো করিতে প্রবেশ।

ক্ষণেক পাণ্ডবসেনা করিয়া সমর,
সহিতে না পারি বড় হইল ফাঁপর।
এতেক দেখিয়া তবে রাজা যুধিষ্ঠির,
মহাভয়ে হইলেন কম্পিতশরীর।
হেনকালে মনেতে পড়িল আচম্বিত;
অভিমন্যু মহাবীরে ডাকেন ত্বরিত।
আইল অর্জ্জুনপুত্র রাজার আদেশে;
ভূমিষ্ঠ হইয়া বীর রাজারে সম্ভাষে।
ধর্ম্ম বলিলেন পুত্র! শুনহ বচন;
ব্যূহ ভেদিবারে তুমি জ্ঞান প্রকরণ।
অভিমন্যু বলে পিতঃ! করি নিবেদন;
প্রবেশ জানি যে নাহি জানি নির্গমন।
তবে যে আদেশ পিতঃ! করেন আপনি;
সেবক সন্তান আমি পালিব তখনি।
তুষ্ট হয়ে বলিলেন ধর্ম্মের নন্দন;
তোমার পশ্চাতে যাব সব যোদ্ধাগণ।
ব্যূহ ভেদি মার পুত্র! দ্রোণ ধনুর্দ্ধর;
তোমার বিক্রম যত আমাতে গোচর।
তোমার পশ্চাতে যাব ভীম আদি করি;
সত্বর আইস পুত্র! দ্রোণেরে সংহারি।
গোষ্ঠীর জীবন তুমি নয়নের তারা;
না দেখিলে তোমারে নিমিষে হই হারা।

প্রাণ পাঠাইয়া রব সংশয়ের স্থানে ;
তোমার পশ্চাতে যাই যত যোদ্ধাগণে।
এত বলি শিরে রাজা করেন চুম্বন ;
প্রশংসিয়া ঘন ঘন দেন আলিঙ্গন।
কিশোর বয়স সবে নব্য কলেবর ;
ভুবনমোহন রূপ মধুময় স্বর।
অগুরু চন্দন গায় বায়ু বহে গন্ধ ;
ভুবনবিজয়ী বীর সদাই সানন্দ।
মণি মরকত আদি আভরণ গায় ;
হেরিলে জুড়ায় আঁখি আপদ পলায়।
পীতাম্বর পরিধান হাতে শর ধনু ;
সাহসে সিংহের প্রায় দোষহীন তনু।
রাজারে কহিল বীর নাহি কোন ভয় ;
করিব সমরে আজি রিপুগণক্ষয়।
আজি যুদ্ধে বিনাশিব দ্রোণ ধনুর্দ্ধরে ;
দ্রোণেরে না মারি আমি না আসিব ঘরে।
এত বলি যুঝিতে চলিল বীরবর ;
সারথিরে বলে রথ সাজাও সত্বর।
কাতরে সারথি বলে করি যোড় কর ;
এক নিবেদন মম শুন ধনুর্দ্ধর।
অত্যল্প বয়স তব নবীন যৌবন ;
দ্রোণসহ তোমার উচিত নহে রণ।

যমের সমান ঘোর দেখ দ্রোণবীর ;
যার বাণে যোদ্ধাগণ কেহ নহে স্থির।
এতেক শুনিয়া বীর ক্রোধে হুতাশন ;
সারথিরে চাহি বলে করিয়া তর্জ্জন।
কৃষ্ণের ভাগিনা আমি অর্জ্জুন-তনয় ;
ত্রিভুবনমধ্যেতে কাহারে মোর ভয় ?
দ্রোণের সহিত আমি করিব সমর ;
এক বাণে তাঁহাকে পাঠাব যমঘর।
আজি যদি দ্রোণে মারিবারে আমি পারি,
বড় তুষ্ট হইবেন মাতুল শ্রীহরি।
পিতার অধিক ধর্ম্মরাজ মহারাজ ;
প্রাণ দিয়া অবশ্য সাধিব তাঁর কাজ।
এই দণ্ডে রথ তুমি সাজাও সত্বর ;
অবশ্য করিব যুদ্ধ নাহি কিছু ডর।
এতেক শুনিয়া তবে সারথি সত্বর,
তুলিল বিবিধ অস্ত্র রথের উপর।
মহাদর্প করি উঠে রথের উপর ;
ব্যূহ ভেদিবারে যায় পাণ্ডুবংশধর।
ভীম আদি তবে যত মহারথিগণ ;
তাহার পশ্চাতে চলে করিবারে রণ।
ব্যূহে প্রবেশিল বীর চক্ষের নিমিষে ;
নানা অস্ত্রগণ সৈন্য উপরে বরিষে।

প্রলয়ের মেঘ যেন সংহারিতে সৃষ্টি,
ততোধিক অভিমন্যু করে বাণবৃষ্টি।
রণক্ষেত্রে শোণিতের বহে স্রোতস্বতী;
কুরুসৈন্য-রক্তে স্নান করে বসুমতী।
ভীম আদি করিয়া যতেক বীরগণ,
ব্যূহমুখে গিয়া সবে করে মহারণ।
জয়দ্রথ ব্যূহ রক্ষা করে প্রাণপণে;
না দেয় দুয়ার ছাড়ি কোন বীরগণে।
জয়দ্রথ যুদ্ধ করে অতি ঘোরতর,
সর্ব্ববীরে বিমুখ করিল একেশ্বর।
ব্যূহে প্রবেশিল বলে অভিমন্যু বীর;
ভীম আদি যোদ্ধা সবে হইল অস্থির।
নাহি দিল জয়দ্রথ প্রবেশিতে পথ;
চিন্তাকুল হৈল বড় পড়িল বিপদ।
ব্যূহ ভেদি গেল পুত্র নিজ বীরপণে;
তাহাতে কহিল শুনি নির্গম না জানে।
জানিয়া সমূহ সৈন্য মাঝে গেল রণে;
সঙ্কটে পড়িল রক্ষা পাইবে কেমনে?
হেথা না দেখিয়া বীর সৈন্য নিজ পাশ;
জানিল নিশ্চয় বিধি করিল নিরাশ।
উপায় কি আছে আর, অপায়ের সিন্ধু
পড়িয়াছে, পার নাই বিনা বিধি বন্ধু।

এত ভাবি সাহস করিল মহাবীর ;
বাণবৃষ্টি করি সৈন্য করিল অস্থির।
এক রথে অভিমন্যু করে মহামার ;
দেখিয়া কৌরবগণে লাগে চমৎকার।
চৌদিকে বেষ্টিত যত কুরুসৈন্যচয় ;
পিঞ্জরমধ্যেতে যেন পোষা পক্ষী রয়।
না জানে বালক সেই নির্গমের সন্ধি ;
মীন যেন পড়িল হইয়া জালে বন্দি।
তথাপি অভয় ধনু লইলেক হাতে ;
মথিত করিয়া সৈন্য ভ্রমে এক রথে।
জলদ বরিষে যেন কালে বরিষায় ;
ঝাঁকে ঝাঁকে অস্ত্র পড়ে ক্ষমা নাহি তায়।
তুরঙ্গ মাতঙ্গ পড়ে পদাতি মাহুত ;
কোটি কোটি যোদ্ধা পড়ে সংগ্রাম অদ্ভুত।
অলস না হয় তনু সাহসী বালক ;
সৈন্যারণ্য রণে দহে হইয়া পাবক।
প্রকাশে বিক্রম যত নাহি তার সীমা ;
ধন্য ধন্য বালকের বীরত্বমহিমা।
মূর্চ্ছিত হইল কর্ণ দ্রোণ আদি রথী ;
মূর্চ্ছিত দেখিয়া রথ ফিরায় সারথি।
অর্জ্জুনতনয় যোল বৎসরের শিশু,
সৈন্যমধ্যে সিংহ যেন পায় বনপশু।

এক রথে অর্দ্ধেক সামন্ত করে নাশ ;
আর যত কুরুসেনা হইল নিরাশ।
এক শত সহোদর রাজা দুর্য্যোধন ;
তাহাসবাকার যত আছিল নন্দন ;
একে একে অভিমন্যু করিল সংহার ;
দেখি দুর্য্যোধন রাজা করে হাহাকার।
ষোড়শ বৎসর তার পূর্ণ নাহি হয় ;
কেহ না পারিল তারে করিতে বিজয়।
আর্জ্জুনিরে (১) দেখি কাল শমন সমান ;
ভয়ে আর কোন বীর নহে আগুয়ান।
আকুল হইয়া তবে রাজা দুর্য্যোধন,
দ্রোণে চাহি বলিতে লাগিল সেইক্ষণ।
তোমা সব মহারথী আছ বিদ্যমান ;
বালক হইয়া করে এত অপমান।
বুঝিলাম জয় নাহি আমার সমরে ;
একেলা মারিয়া আজি যাইবে সবারে।
পার্থসুতে তুষ্ট তুমি বুঝিনু বিধানে ;
তাই সংহারিছে সব তব বিদ্যমানে।
এতেক শুনিয়া দুর্য্যোধনের উত্তর ;
ক্রোধমুখে কহে তারে দ্রোণ বীরবর।

(১) আর্জ্জুনি—অর্জ্জুনের পুত্র অভিমন্যু।

তব কর্ম্ম প্রাণপণে করি অনুক্ষণ ;
তথাপিহ হেন ভাষা কহ দুর্য্যোধন !
অভিমন্যু জিনে হেন নাহি কোন জন ;
তার ডরে পলাইলে লইয়া জীবন।
বাপের সোসর বীর যমের সমান ;
বজ্রের সমান যার অব্যর্থ সন্ধান।
কর্ণ হেন যোদ্ধা যারে নারিল সমরে ;
আর কে আছয়ে হেন জিনিবে তাহারে।
ন্যায়যুদ্ধে আর্জ্জুনিরে জিনিতে যে পারে ;
কহিলাম হেন বীর নাহিক সংসারে।
ভাগিনেয় কৃষ্ণের সে অর্জ্জুনের সুত ;
দেখিলা সাক্ষাতে যার সমর অদ্ভুত।
ন্যায়যুদ্ধে তাহারে নারিব কদাচন ;
কহিনু জানহ মম স্বরূপ বচন।
  দুর্য্যোধন বলে শুন আমার বচন ;
সপ্ত রথী এককালে কর গিয়া রণ।
আমিও যাইব তোমা সবার পশ্চাৎ ;
এইরূপ করি তারে করহ নিপাত।
  এতেক শুনিয়া দ্রোণ বিরসবদন ;
এমন অন্যায় নাহি করে কোন জন।
দ্রোণাচার্য্য বলে এ ত অদ্ভুত কথন !
কিমত প্রকারে ইহা হয় দুর্য্যোধন !

এমত অন্যায় যুদ্ধ কভু নাহি করি ;
এত বলি দ্রোণাচার্য্য স্মরিল শ্রীহরি।
এত শুনি কৃপাচার্য্য নিশ্বাস ছাড়িল ;
দুর্নীত রাজার হাতে বিধি নিয়োজিল।
আমা সবাকার ইথে কি করে বিলাপে ;
মরিবেক দুর্য্যোধন এই মহাপাপে।
দুর্য্যোধন বলে যদি ইহা না করিবে ;
সবারে মারিয়া আজি জানিনু যাইবে।
প্রধানের সর্ব্ব দোষ অন্যায়ে কি ভয় ?
বধিতে রিপুকে মম এই বিধি হয়।
মজিল সকল সৃষ্টি ব্যাজ নাহি সয় ;
সর্ব্বনাশ কৈল শিশু শমন উদয়।
মম বাক্যে তোমা সবে কর এই মতি ;
এককালে অভিমন্যু বেড় সপ্ত রথী।
রাজ্যমদে অন্ধ রাজা না দেখে মরণ ;
আজ্ঞা দিল বধ শীঘ্র পার্থের নন্দন।
ভদ্র নাহি নৃপতির হইল প্রমাদ ;
সপ্ত রথী রথে চড়ে ভাবিয়া বিষাদ।
বেড়িল বালকে গিয়া সপ্ত মহারথী ;
হানাহানি মহাযুদ্ধ হয় অবিরতি।
এককালে সপ্ত রথী করে অস্ত্রময় ;
রবি আচ্ছাদিল বাণে অন্ধকার হয়।

একযোগে সপ্ত রথী অস্ত্র বরষিল ;
অমর ভুজঙ্গ নর চকিত হইল।
যেন সৃষ্টি মজাইতে ইচ্ছা বিধাতার ;
বাণবৃষ্টি হয় যেন মুষলের ধার।
হইল পাবক তুল্য আৰ্জ্জুনি কুপিয়া ;
কৌরবদলের এত অন্যায় দেখিয়া।
হাহাকার আকাশে অমরগণ করে ;
সপ্ত মহারথী বেড়ে এক বালকেরে।
বিধি বিড়ম্বিল দুর্য্যোধন দুরাচারে ;
এমত অন্যায় যুদ্ধ সে কারণে করে।
কভু হেন বিপরীত না দেখি না শুনি ;
ঘিরিল নিশ্চয় দুষ্ট গরাসিল ফণী।
যতনে সন্ধান পূরি শিশু এড়ে বাণ ;
নিমেষে সকল অস্ত্র করে খান খান।
কাটিয়া সবার অস্ত্র অর্জ্জুনতনয়,
বজ্রহেন বাণে বিন্ধে সবার হৃদয়।
মূর্চ্ছা দেখি রথীর সারথি লয়ে রথ,
পলাইল রথী লয়ে যোজনেক পথ।
সপ্ত রথী এইরূপে যুঝে সাত বার ;
সবাকারে পরাজিল অর্জ্জুনকুমার।
অবসাদ নাহি অস্ত্র এড়ে শত শত ;
কোটি কোটি হয় সেনা সমরেতে হত।

হয় পড়ে নাহি সীমা কুঞ্জরের দল ;
রথে পথ ঢাকিল চলিতে নাহি স্থল।
কতক্ষণে সপ্ত রথী পাইল চেতন ;
লজ্জায় সবার যেন হইল মরণ।
কারো মুখ কেহ নাহি চায় অভিরোষে ;
রথ এড়ি মহীতলে মাথা ধরি বৈসে।
কি হইল কি হইবে এ কুমার যম ;
পলায়িস্নু অবসাদে বলে হয়ে কম।
চিন্তায় আকুল চিত কূল নাহি দেখি ;
মজিলাম অবোধ রাজার হাতে ঠেকি।
বালকের শ্রম নাই আরো বাড়ে বল ;
পতঙ্গের প্রায় দেখে কুরুসৈন্যদল।
নলবন দলে যেন মদমত্ত হাতী ;
নিপাতে নিমেষে লক্ষ লক্ষ সেনাপতি।
সর্ব্বনাশ দেখি তবে রাজা দুর্য্যোধন,
ছাড়িল জীবন-আশা শুকাল বদন।
অধোমুখ বীরগণ বুক নাহি বান্ধে ;
নৃপতির চরণযুগল ধরি কান্দে।
কেশরী সমান শিশু মৃগ যেন পেয়ে,
সংহারে সকল সৈন্য দেখ কিবা চেয়ে।
আকুল হইয়া রাজা রথী সপ্ত জনে,
কহিতে লাগিল অতি বিনয় বচনে।

দেখ! গুরু মহাশয়! কর্ণ প্রাণসখা!
বিনাশিল সর্ব্ব সৈন্য অভিমন্যু একা।
শুন শুন সপ্ত রথী আমার বচন;
পুনর্ব্বার অভিমন্যু বেড় সপ্ত জন।
সাহসে না হও হীন সতর্ক হইয়া;
মোরে রক্ষা কর এই বালক বধিয়া।
জয় করি সমর পূরাহ যদি আশ;
কিনিয়া করিলা তবে মোরে নিজ দাস।
রাজার বিনয় শুনি প্রাণ করি পণ;
পুনরপি চলে তারা করিবারে রণ।
রথে বৈসে বিক্রমে বাসব-তেজ ধরি;
সারথি চালায় রথ শিশু বরাবরি।
প্রাণপণে করে রণ প্রাণে ছাড়ি আশা;
সাহসে বান্ধিয়া বুক করিল ভরসা।
বালকে বেড়িয়া বাণ বরিষয় তারা;
মেঘ যেন বরিষয় মুষলের ধারা।
নিবারণ করি অস্ত্র অভিমন্যু বীর;
খণ্ড খণ্ড করে বাণে সবার শরীর।
ধারায় রুধির ধায় অবিরত গায়;
তথাপি তিলেক ভ্রম নাহি করে তায়।
তবে কর্ণ মহাবীর মানিয়া বিস্ময়,
প্রমাদ দেখিয়া ডাকি ছয় জনে কয়।

অর্জ্জুন অধিক শিশু মহাপরাক্রম ;
অবসাদ বলিয়া তিলেক নাহি ভ্রম।
সাবধান হইয়া সবাই কর রণ ;
এককালে সন্ধান করহ সর্ব্বজন।
কেহ কাট ধনুখান কেহ কাট গুণ ;
কেহ কাট রথ অশ্ব কেহ কাট তূণ।
এই সে উপায় বিনা নাহি দেখি আর ;
কাল অগ্নি সম শিশু দেখ চমৎকার!
তবে সপ্ত রথী পুন বেড়িল কুমারে ;
এককালে সন্ধান করিল সাত বীরে।
কেহ কাটে ধনু তার কেহ কাটে গুণ ;
কেহ কাটে রথ অশ্ব কেহ কাটে তূণ।
যত ধনু লয় শিশু চক্ষু পালটিতে ;
সে সব কাটয়ে তারা গুণ নাহি দিতে।
অস্ত্র ধনু কাটা গেল রথের সারথি ;
শূন্য হাতে হৈল যেন মদমত্ত হাতী।
অসি চর্ম্ম লয়ে বীর করে মহামার ;
সর্ব্বাঙ্গে বহিছে তার রুধিরের ধার।
বড় বড় রথী মারে পর্ব্বতের চূড়া ;
খান খান করে রথ হয়ে যায় গুঁড়া।
শত শত হস্তী মারে পর্ব্বতের কায় ;
তুরগ পদাতি কত ধরণী লোটায়।

তবে কর্ণ আকর্ণ সন্ধানে এড়ে শর ;
সেই বাণে চর্ম্ম কাটি ফেলায় সত্বর।
কাটা চর্ম্ম আচ্ছাদন নাহি কিছু আর ;
গায়ে আসি পড়ে অস্ত্র হাজার হাজার।
শুধু অসি লইয়া সমর করে বীর ;
আশে পাশে সম্মুখে সৈন্যের কাটে শির।
বড় বড় বীর মাঝে বড় বড় রথী ;
নিবারে নিকটে নাহি কাহারো শকতি।
হস্তী মারে হাজার হাতের তড়বড়ি ;
অসংখ্য পদাতি পড়ি যায় গড়াগড়ি।
তবে কোপে অশ্বথামা পূরিয়া সন্ধান,
কাটিল হস্তের অসি করি খান খান।
অস্ত্র রথ দুই গেল একেলা কুমার ;
চারি দিক্ হৈতে হয় অস্ত্র অবতার।
পঙ্গপাল পাতে জাল চারি দিকে ছাকা ;
পলাইতে পথ নাই কি করিবে একা।
নৃপতি অধর্ম্মী বড় অন্যায় সমর
করিয়া বালক মারে পাপিষ্ঠ পামর।
অবসাদ পেয়ে বীর এড়িল নিশ্বাস ;
আজি রক্ষা নাহি আর অবশ্য বিনাশ।
আচরিয়া অধর্ম্ম অন্যায় কৈল রণ ;
কেমনে ইহাতে রক্ষা পাইবে জীবন।

পিতা রণ করে সেনা নারায়ণী যথা ;
তিনি মাত্র না জানেন এতেক বারতা
কৃষ্ণ মোর মাতুল অর্জ্জুন মোর বাপ ;
মৃত্যুকালে না দেখিনু এই মনস্তাপ।
এতেক চিন্তিয়া শিশু হইল নিরাশ ;
উৎপাত অনল যেন এড়িল নিশ্বাস।
হাতে করি লইল রথের চক্রদণ্ড ;
যমচক্র সম সেই বড়ই প্রচণ্ড।
চূর্ণ করে তাহে রথী হাজার হাজার ;
তুরঙ্গ মাতঙ্গ মারে সংখ্যা নাহি তার।
সহস্র সহস্র বীরে বধিল বালক ;
নিবাইতে সাধ্য কার জ্বলন্ত পাবক।
তবে কর্ণ পাঁচ বাণ পূরিয়া সন্ধান ;
চক্রদণ্ড কাটিয়া করিল খান খান।
চক্রদণ্ড গেল যদি চক্র নিল হাতে ;
দানবের যুদ্ধ যেন জগন্নাথ সাথে।
তাহাতে অনেক সৈন্য শোয়াইল ক্ষিতি ;
লেখা জোখা নাহিক মারিল ঘোড়া হাতী।
চক্রহস্তে বিষ্ণু যেন অতি জ্যোতির্ম্ময় ;
তাহার সমান শোভা অভিমন্যু হয়।
অভিমন্যু করে রণ রথচক্র হাতে ;
রথচক্র কাটে কর্ণ তিন বাণাঘাতে।

শূন্য হস্তে ব্যস্ত শিশু তবু নাহি ত্রাস ;
ভরসায় যুঝে বীর যতক্ষণ শ্বাস।
পদাঘাত করাঘাত প্রহারয়ে যারে ;
সেইক্ষণে তাহারে পাঠায় যমঘরে।
মদমত্ত হস্তী যেন মহাভয়ঙ্কর ;
মুষ্ট্যাঘাতে রথ রথী বিনাশে কুঞ্জর।
চারি দিকে বীরগণ বরিষয়ে বাণ ;
বাণে বাণে হৈল অঙ্গ সাজারু সমান।
জর্জ্জর হইল অঙ্গ বিকল শরীর ;
পড়িয়া ধরণী ধারা বহিছে রুধির।
পুনঃ সপ্ত রথী করে বাণ বরিষণ ;
অস্ত্রাঘাতে অভিমন্যু হৈল অচেতন।
হেনকালে দুষ্ট দুঃশাসনের নন্দন,
গদাহাতে করি ধায় মহাক্রুদ্ধ মন।
অরুণ জিনিয়া রক্ত ঘূর্ণিত নয়ন ;
দৈবে যাহা করে তাহা কে করে খণ্ডন।
সম্বিৎ পাইয়া শিশু উঠিবে যেমনি ;
অমনি দুর্জ্জয় গদা হানে দৌঃশাসনি (১)।
আর্জ্জুনির শিরে করে গদার প্রহার ;
দেখিয়া অমরগণ করে হাহাকার।

(১) দৌঃশাসনি—দুঃশাসনের পুত্র।

এমত অন্যায় করে দুষ্ট দুর্য্যোধন;
এই পাপে হইবেক সবংশে নিধন।
গদার প্রহারে বীর পায় বড় মোহ;
অভিমানে নয়নযুগলে পড়ে লোহ।
না দেখিল জনকে মাতুল কৃষ্ণরূপে;
মৃত্যুকালে সেই নাম মনে মনে জপে।
সম্মুখসমরে বীর ছাড়িল জীবন;
ত্রিভুবনে হাহাকার পড়িল রোদন!

অবন্তিবর্ম্মা।

কাশ্মীরে কর্কোটবংশীয় ভূপালগণের রাজত্বকাল বিলুপ্ত হইলে, উৎপলবংশীয় অবন্তিবর্ম্মা সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তাঁহার কতিপয় পূর্ব্ববর্ত্তী রাজার সময় হইতে কাশ্মীরে ঘোর প্রজাবিপ্লব চলিতেছিল, সর্ব্বত্র অত্যাচার ও বিদ্রোহ; কাহারও ধন প্রাণ নিরাপদ ছিল না। তিনি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রাণপণে সেই অশান্তির নিবারণে বদ্ধপরিকর হইলেন। ধার্ম্মিক ও সুবিজ্ঞ শূর-নামক মন্ত্রিবরের সাহায্যে তিনি স্বল্পকাল মধ্যেই রাজ্যের অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রু নিরাকৃত করিয়া সর্ব্বত্র শান্তি ও সদ্ভাব স্থাপন করিলেন। অনন্তর কায়মনোবাক্যে প্রজাগণের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধনে দীক্ষিত হইলেন। কাশ্মীরে বিদ্যা ও

ধর্ম্মকর্ম্মের আলোচনা ক্রমে লোপ পাইতেছিল, রাজা নানা দেশের জ্ঞানবীর ও ধর্ম্মবীর ব্যক্তিগণকে স্বদেশে আহ্বান করিলেন এবং দানে ও মানে পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহাদিগকে অভিমত কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন।

রাজা ও মন্ত্রী পরস্পর অকুণ্ঠিতভাবে পরস্পরকে আজ্ঞা দান করিতেন এবং পরস্পরের আজ্ঞা পালন করিতেন। রাজা কৃতজ্ঞ ও ক্ষমাশীল, এবং তাঁহার মন্ত্রিবর ভক্ত ও নিরহঙ্কার, উভয়েই সর্ব্বান্তঃকরণে প্রজার কল্যাণসাধনে ব্রতী, যেন মণি-কাঞ্চনের যোগ হইল; আর সকল কর্ম্মচারীও তাঁহাদের অনুকরণ করিল। দিন দিন রাজ্যে নব নব উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত হইতে লাগিল। শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, কৃষি ও বাণিজ্য প্রভৃতি সকল বিষয়েই অসাধারণ শ্রীবৃদ্ধি হইল; সৎকর্ম্মের স্রোত সহস্র ধারায় বহিতে লাগিল। সেই রাজা ও মন্ত্রিবরের চরিত্রের জ্যোতিঃ এরূপ প্রদীপ্ত হইল যে তাঁহাদের নাম করিবামাত্র সকলের শরীর আনন্দে কণ্টকিত হইত।

শূর মন্ত্রী এরূপ প্রভুভক্ত ছিলেন যে, রাজার প্রিয়কার্য্যের জন্য ধন, প্রাণ ও পুত্র পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। কথিত আছে, রাজা অবন্তিবর্ম্মা একদা কোন দেবালয়ে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, দেবপীঠের উপর উৎপলশাক নামক কতকগুলা বন্য তিক্ত শাক পতিত রহিয়াছে। তিনি তত্রত্য লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—দেবতাকে এরূপ জঘন্য সামগ্রী নিবেদন করিবার কারণ কি? তাহারা কহিল,—নরদেব! লহরপ্রদেশে

ধন্ন নামে এক ডামর বাস করে (১), মন্ত্রিবর শূর তাঁহার হস্তে এ সকল স্থানের দেব-সেবার ভার অর্পণ করিয়াছেন। মন্ত্রিবর সেই দুর্বৃত্তের কপট ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে প্রাণাধিক সন্তানের ন্যায় স্নেহ করেন, সে প্রশ্রয় পাইয়া ঘোর উৎপীড়ন আরম্ভ করিয়াছে, দেবসেবার সমস্ত অর্থ নিজ সেবায় নিযুক্ত করিয়াছে, এবং ছলে ও বলে এ সকল গ্রামের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছে। লোকের এরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে যে, এই অভক্ষ্য তিক্ত শাক ভিন্ন আর প্রাণধারণের উপায় নাই; অগত্যা ইহাই দেবতাকে নিবেদন করিতে হয়। রাজা ইহা শ্রবণমাত্র পূজা না করিয়াই দেবালয় হইতে প্রস্থান করিলেন। প্রজার সেই দুঃখের কথা তাঁহার হৃদয়ে শেলসম বিদ্ধ হইল। বিচক্ষণ মন্ত্রী রাজার সেই মনস্তাপের কারণ জ্ঞাত হইয়া স্নেহানুরোধ ত্যাগ করিয়া সেই দুর্বৃত্ত ডামরের প্রাণদণ্ড করিলেন। রাজা মন্ত্রীর প্রভুভক্তি দর্শনে প্রীত হইলেন বটে, কিন্তু অপরাধীর তাদৃশ নিদারুণ দণ্ডের কথা শুনিয়া লজ্জিত ও শোকাকুল হইলেন।

রাজা অবন্তিবর্ম্মার সময়ে কাশ্মীরে অগণ্য মঠ, মন্দির, আশ্রম, পান্থনিবাস, আরোগ্যশালা, অন্নসত্র প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি যথানিয়মে ঐ সকলের তত্ত্বাবধান করিতেন। রাজকোষ দীন-দরিদ্রগণের জন্য উন্মুক্ত এবং রাজভবনের দ্বার

(১) লহর—বর্ত্তমান লাহোর প্রদেশ। ডামর—একপ্রকার বর্ণসঙ্কর, ইহারা শিবের উপাসক।

রাজদর্শনার্থিগণের নিকট অবারিত ছিল। রাজা স্বহস্তে অঞ্জলি পূরিয়া দরিদ্র অর্থিগণকে ধন দান করিতেন। একদা কোন অর্থী তাঁহার নিকট অভিমত অর্থ লাভ করিয়া, "ধন্য মহারাজ!" এই কথা বলিতে গিয়া হর্ষভরে "ধন্য অবন্তি" এই কথা বলিয়াছিল। রাজা তাহার সেই সরল সম্ভাষণে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বহু ধন দান করিয়াছিলেন। প্রজামাত্রেই তাঁহাকে পরমাত্মীয় জ্ঞান করে এবং তাঁহার প্রতি তদনুরূপ ব্যবহার করে, ইহা তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। তিনি কদাচ পদের বা ঐশ্বর্য্যের অভিমান করিতেন না; পরোপকার ভিন্ন লক্ষ্মীর আর কোন সার্থকতা আছে ইহা জানিতেন না। অন্যান্য রাজার যশোগানের জন্য বৈতালিক নিযুক্ত থাকে, তাঁহারও বৈতালিক নিযুক্ত ছিল। সেই রাজা ও সচিববর যখন রাজসভায় ধর্ম্মাসনে উপবেশন করিতেন, তখন বৈতালিক এইরূপ গান করিত (১);—

"অনিত্য জানিবে ভবে বিভবের খেলা;
পর-উপকার তবে কর এই বেলা;
এ দিন না রবে যবে আসিবে শমন;
কোথা বা থাকিবে তুমি কোথা রবে ধন।"

তাঁহারা যে পরম পবিত্র পরোপকার-ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন,

(১) মূল শ্লোক যথা—
"অয়মবসর উপকৃতয়ে প্রকৃতিচলা যাবদস্তি সম্পদিয়ম্।
বিপদি সমাভ্যুদয়িন্যাং পুনরুপকর্ত্তুং কুতোঽবসরঃ॥"
(রাজতরঙ্গিণী, পঞ্চম তরঙ্গ, ৩৭ শ্লোক।)

তাঁহাদিগের হৃদয়ে তাহা জাগরূক করিবার জন্য বৈতালিক এইরূপ গান করিত।

রাজা অবন্তিবর্ম্মা অসীম রাজভোগের অধিকারী হইয়াও প্রকৃত তপস্বীর ন্যায় থাকিতেন, সামান্য আহার ও সামান্য পরিচ্ছদেই তাঁহার অনুরাগ ছিল। তিনি মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেন যে,—"রাজলক্ষ্মী হৃদয়ে বিষময়ী ভোগতৃষ্ণার উদ্রেক করিয়া দিয়া অতি উন্নতস্বভাব ব্যক্তিকেও নিতান্ত নীচ-প্রকৃতি করিয়া তুলে। সর্ব্বপ্রযত্নে ঐশ্বর্য্যের সেবা করিয়াও কেহ সুখী হইতে পারে না। যাহার প্রতি এত স্নেহ, এত মমতা ও এত যত্ন, পরলোকযাত্রাকালে সেই লক্ষ্মী একবার ফিরিয়াও চায় না; সেই পরলোকযাত্রী পথিকের হস্তে এক কপর্দ্দকও পাথেয় দেয় না; লক্ষ্মীর সেবককে শেষে নিতান্ত নিঃসম্বল ও অসহায় হইয়া বিদায় লইতে হয়। মৃত ভূপালগণের নামাঙ্কিত মণি কাঞ্চন ব্যবহার করিবার সময় চিত্তে গর্ব্বের উদয় না হইয়া বরং বৈরাগ্যেরই উদয় হওয়া উচিত। পূর্ব্ব রাজারা মৃত্যুকালে ঘন ঘন শ্বাস ও শোকবাষ্পে যে সকল রাজ-ভূষণ দূষিত করিয়া গিয়াছেন, নবীন রাজার সেই সকল পরিধান-কালে মনে হর্ষের উদয় না হইয়া বিষাদের উদয় হওয়া উচিত।" তিনি এইরূপ বিবেচনা করিয়া, অযথা উপভোগ ও বৃথা আড়ম্বরে একান্ত বিমুখ ছিলেন।

পৃথিবীর যথায় যে ধর্ম্মবীরের সুখ্যাতি তাঁহার কর্ণগোচর হইত, তিনি বহু যত্নে ও বহু ব্যয়ে তাঁহাকে আনাইয়া সর্ব্বদা

নিকটে রাখিতেন, এবং তাঁহার প্রতি সমুচিত ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিতেন। ফলতঃ তিনি সর্ব্বক্ষণ ধার্ম্মিকবৃন্দে পরিবেষ্টিত থাকিতেন। তাঁহার রাজত্বে প্রকৃত গুণী লোক রাজার অধিক সম্মান লাভ করিতেন। তাঁহার সুশাসনের গুণে প্রজালোকের কাহারও গৃহে অন্ন বিনা হাহাকার ঘটে নাই। প্রজার বিপদ্ দুই প্রকার; দৈবী ও মানবী। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, মারীভয়, ভূমিকম্প প্রভৃতি যে সকল বিপদের উপর মানুষের কোন হাত নাই, সে সকলকে দৈবী বিপদ্ বলে। চৌর্য্য, দস্যুভয়, রাজার লোভ, রাজপুরুষের অত্যাচার, প্রভৃতি যে সকল বিপদ্ মনুষ্য দ্বারা সংঘটিত হয়, সেই সকলকে মানবী বিপদ্ বলে। রাজা অবন্তিবর্ম্মা স্বয়ং নির্লোভ, ও কর্ত্তব্যপালনে অপ্রমত্ত ছিলেন, এজন্য তাঁহার রাজত্বে প্রজারা সর্ব্বপ্রকার মানবী বিপদ্ হইতে মুক্ত হইয়াছিল; কাশ্মীর বহুকালের পর তাঁহার হস্তে শান্তিসুখ লাভ করিয়াছিল। তিনি প্রজার নিকট হইতে যে ধর্ম্মগণ্ডা লইতেন, তাহা আবার তাহাদেরই মঙ্গলার্থে নিয়োজিত করিতেন। প্রজারা ভোগ করিত, তিনি সেই ভোগ্যসামগ্রী সুব্যবস্থামত তাহাদিগকে বণ্টন করিয়া দিতেন। তিনি আপনাকে সকলের পরিচারক জ্ঞান করিয়া প্রফুল্ল মনে আপন পরিচর্য্যাব্রত পালন করিতেন। এই উদার কর্ত্তব্যপালনে তিনি যাবজ্জীবন কখনও আলস্য করেন নাই।

রাজা অবন্তিবর্ম্মা, কত কাল হইল, মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন, তাঁহার পর কাশ্মীরে কত রাজা ও রাজবংশের

উত্থান ও পতন হইল, কত বিপ্লব ও বিপর্য্যয় ঘটিল, কিন্তু অদ্যাপি তিনি স্বদেশে ও স্বদেশের ইতিহাসে জাজ্বল্যমান রহিয়াছেন।

বাণভট্ট।

মহর্ষি বৎস হইতে যে ধারাবাহী বংশ চলিয়াছে, তাহা বাৎসায়ন নামে বিখ্যাত। সেই মহাবংশে কুবের নামক ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করেন। কুবের অদ্ভুত যাজ্ঞিক ও অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। কুবেরের চারি পুত্র, যথা—অচ্যুত, ঈশান, হর ও পাশুপত; তন্মধ্যে পাশুপতের অর্থপতি নামে একমাত্র পুত্র জন্মিল। অর্থপতি যে কেবল পণ্ডিত এমত নহে, অসাধারণ যাজ্ঞিক ও বদান্য ছিলেন। অর্থপতির একাদশ পুত্র, যথা—ভৃগু, হংস, শুচি, কবি, মহীদত্ত, ধর্ম্ম, জাতবেদা, চিত্রভানু ত্র্যক্ষ, অহিদত্ত, ও বিশ্বরূপ। ইহাঁরা সকলেই সুপণ্ডিত ছিলেন, বিশেষতঃ চিত্রভানুর পাণ্ডিত্যের গৌরব সর্ব্বত্র খ্যাত হইয়াছিল। এই চিত্রভানু মহাকবি বাণভট্টের পিতা; বাণের মাতার নাম রাজদেবী। আদিপুরুষ হইতে ইহাঁদের বাসস্থান প্রীতিকূট। দণ্ডকারণ্যে যথায় শোণনদ বিন্ধ্যগিরি হইতে নির্গত হইয়াছে, তাহার পশ্চিম তীরে এই প্রীতিকূট গ্রাম অবস্থিত ছিল।

অতি শৈশবেই বাণের মাতৃবিয়োগ হয়। তাঁহার পিতা চিত্রভানু মাতার ন্যায় পরম যত্নে সেই মাতৃহীন শিশুর লালন পালন করিতে লাগিলেন। সেই বালক যে বিখ্যাত পণ্ডিতের

বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার চিহ্ন বাল্যকাল হইতেই প্রকাশ পাইতে লাগিল। সময়ে সময়ে সেই বালকের অদ্ভুত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়া তদীয় পিতা ও পিতৃব্যেরা চমৎকৃত হইতেন। বাণপিতা অষ্টম বর্ষে পুত্রের উপনয়ন দিয়া বিদ্যারম্ভ করাইলেন। কথিত আছে, বাণ চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সে পিতার নিকট হইতে সমস্ত বেদবিদ্যা লাভ করেন। কিন্তু কিছু দিনের জন্য তাঁহার সৌভাগ্য-সূর্য্য অস্তমিত হইল। তাঁহার পিতা তাঁহাকে চতুর্দ্দশবর্ষীয় বালক রাখিয়া পরলোক গমন করিলেন। তিনি সেই কিশোর বয়সে পিতৃহীন হইয়া অকূল পাথারে পড়িলেন; কিছু দিন শোকে বিহ্বল হইয়া গৃহ হইতে বাহির হইলেন না। অনন্তর বাল্যসুলভ তরলতা ও বিস্মৃতি বশতঃ ক্রমে তাঁহার শোকাবেগ মন্দীভূত হইল; ক্রমে তিনি সমবয়স্কগণের সহিত বিবিধ ক্রীড়াকৌতুকে রত হইয়া পিতৃশোক বিস্মৃত হইলেন। এক্ষণে তিনি অভিভাবকহীন হইয়া, কতকগুলি অসৎ সঙ্গীর কুহকে পড়িলেন। বয়োধর্ম্মে ও অসৎসঙ্গে দিন দিন তাঁহার চরিত্র বিকৃত হইতে লাগিল। অবশেষে কতিপয় দুষ্টসহচরের সহিত কাহাকে না বলিয়া কহিয়া পিতৃগৃহ ত্যাগ করিলেন। (১)

বাণ, অসৎসঙ্গে কিছু দিন নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া শেষে বুঝিতে পারিলেন যে, কুপথে ও কুসংসর্গে কোন সুখ নাই।

(১) বাণের সহচর দুষ্ট বালকেরা অনেকেই অবশেষে প্রসিদ্ধ পাণ্ডিত হইয়াছিলেন।

তিনি যে প্রধান পণ্ডিতের সন্তান, এবং বড় বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার স্মরণ ছিল। তাঁহার মতি গতি ফিরিল; পুনরায় তিনি নিজকুলোচিত সৎপ্রকৃতি লাভ করিলেন। তখন তাঁহার গৃহে ফিরিতে লজ্জা বোধ হইল; ভাবিলেন, এরূপ অবস্থায় গৃহে যাইলে আত্মীয়গণের বিরাগভাজন হইতে হইবে। যদি পিতার নাম রক্ষা করিতে পারি তবেই গৃহে যাইব। মনে মনে এইরূপ সংকল্প করিয়া নানা দেশ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে আমোদের অনুসন্ধানে ইতর লোকের ন্যায় ভ্রমণ করিয়াছিলেন, এবার জ্ঞানার্থী হইয়া প্রকৃত বীরপুরুষের ন্যায় কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন। তিনি যথায় যে জ্ঞানী লোককে দেখিতে পাইতেন, তাঁহার দাসত্ব স্বীকার করিয়া জ্ঞান শিক্ষা করিতে লাগিলেন। যিনি যে বিদ্যার জন্য প্রতিষ্ঠিত, তাঁহার নিকট থাকিয়া পরম যত্নে সেই বিদ্যা লাভ করিলেন। তিনি জ্ঞানভিক্ষু হইয়া প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিলেন। ক্রমে ক্রমে নানা জনপদ, নগর, রাজসভা, পণ্ডিতগোষ্ঠী, পর্ব্বত, বন, উপবন, সরোবর, সরিৎ, সমুদ্র, তীর্থ, আশ্রম, দুর্গ, কান্তার প্রভৃতির সহিত এবং নানা জাতির ও নানা ধর্ম্মাবলম্বীর আচার ব্যবহারের সহিত তাঁহার পরিচয় হইল, সমস্ত শাস্ত্রে তাঁহার অধিকার হইল, এবং নানা প্রকার জ্ঞানী ও গুণীর সহিত তাঁহার আত্মীয়তা হইল। তিনি ভূয়োদর্শনবলেই স্বকৃত গ্রন্থে বিবিধ বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অত্যুজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিতে পারিয়াছেন।

দাক্ষিণাত্যব্যাপী বিশাল বিন্ধ্যারণ্যের সমস্ত তরু, লতা, ও পশু, পক্ষী প্রভৃতিকে তিনি যেন নিজ পরিবারের ন্যায় স্নেহ-চক্ষে দেখিতেন। বৃক্ষ হইতে সামান্য পাতাটী পর্য্যন্ত এবং মনুষ্য হইতে কীট পর্য্যন্ত, সকলেরি সর্ব্বপ্রকার অবস্থা তিনি নিপুণভাবে লক্ষ্য করিতেন। তরুকোটরভ্রষ্ট অজাতপক্ষ বিশীর্ণকায় শুকশিশু প্রাণরক্ষার জন্য কিরূপে জলাশয়ের দিকে যাইবার চেষ্টা করিতেছে, তিনি তাহাও তদগতচিত্তে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি অধ্যয়ন ও ভূয়োদর্শন দ্বারা কেবল যে জ্ঞানেরই ভাণ্ডার বৃদ্ধি করিলেন তাহা নহে, তাঁহার চরিত্রও অপূর্ব্ব পবিত্র ভাব ধারণ করিল। তাঁহার অন্তরাত্মা সর্ব্বদাই বিশ্বপ্রেমে দ্রবীভূত থাকিত। যথায় স্নেহ, দয়া, সরলতা, শান্তি ও পবিত্রতার কথা, তথায় তাঁহার লেখনী দ্বিতীয় স্বর্গলোকের সৃষ্টি করিয়াছে; আর যথায় হিংসা, দ্বেষ, বৈর, নিষ্ঠুরতা, কপটতা ও অন্যান্য পাপের কথা, তথায় তাঁহার লেখনী দ্বিতীয় নরকের সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু তিনি নরককে কুৎসিত বলিয়া পরিত্যাগ করেন নাই। তৎকৃত পবিত্র আশ্রমের বর্ণনা ও বিকৃত শবরপুরীর বর্ণনা পাঠ করিলে মনে হয়, তিনি যেমন পবিত্রভাবে স্বর্গে মিশিতে পারিতেন, তেমনি পবিত্রভাবে আবার নরকেও মিশিতে পারিতেন। তাঁহার লেখনী পাতাল হইতে নরলোকে, নরলোক হইতে গন্ধর্ব্বলোকে, গন্ধর্ব্বলোক হইতে সুরলোকে এবং সুরলোক হইতে ব্রহ্মলোকে বিচরণ করিয়াছে এবং সে সকলের অন্তস্তল পর্য্যন্ত উদঘাটন করিয়া

দেখাইয়াছে ; ইহা তাঁহার কৃত কাদম্বরী ও হর্ষচরিত গ্রন্থ পাঠ করিলে জানিতে পারা যায়।

বাণ এইরূপে বিপুল জ্ঞানলাভ করিয়া বহুকাল পরে স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার পুনরাগমনে এবং তদীয় বিদ্যা ও বুদ্ধির অলৌকিক উন্নতি দর্শনে তাঁহার আত্মীয় ও জ্ঞাতিবর্গ পরম আনন্দিত হইলেন। তিনি বহুকালের পর প্রিয়তম স্বদেশ, প্রিয়তম স্বজন ও পরমপ্রেমাস্পদ বাল্যবন্ধুগণকে দর্শন করিয়া যেন স্বর্গসুখ অনুভব করিলেন। তাঁহার জন্মভূমি প্রীতিকূটে বহুতর পণ্ডিতের বাস ছিল ; বিদ্যার্থীরা নানা স্থান হইতে আসিয়া তথায় অধ্যয়ন করিতেন। তথায় অনবরত অধ্যয়ন, অধ্যাপন, বেদগান ও দান ধর্ম্মাদির তরঙ্গ উচ্ছলিত হইত। বাণ তথায় সকলের সম্মানভাজন হইয়া পবিত্র শাস্ত্রালাপ-প্রসঙ্গে পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন। এই সময় স্থাণ্বীশ্বরের রাজা হর্ষদেব (১) বাণের অসাধারণ সুখ্যাতি শুনিয়া

---

(১) স্থাণ্বীশ্বরের বর্ত্তমান নাম থানেশ্বর, ইহা প্রাচীন সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত। রাজা হর্ষদেবের অপর নাম হর্ষবর্দ্ধন, ইনি রাজা প্রভাকরবর্দ্ধনের পুত্র। হর্ষবর্দ্ধন ৬০৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৬৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্য করিয়াছিলেন। বাণভট্ট তাঁহার সমকালের লোক, সুতরাং তিনি খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে বর্ত্তমান ছিলেন। চীনদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধপরিব্রাজক হিয়াঙ্ সিয়াঙ্ সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে কান্যকুব্জের (কনৌজের) সিংহাসনে হর্ষবর্দ্ধনকে দেখিয়াছেন। কান্যকুব্জ হর্ষের ভগিনীপতি গ্রহবর্ম্মার রাজধানী ছিল। মালবরাজ গ্রহবর্ম্মাকে বধ

তাঁহার আনয়নার্থ লোক প্রেরণ করিলেন। বাণ আত্মীয়গণের নিকট বিদায় লইয়া কয়েক দিনের পথ অতিক্রম করিয়া রাজসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। ক্রমে রাজা ও বাণ উভয়ে উভয়ের গুণে মুগ্ধ হইয়া অভেদ্য বন্ধুত্বসূত্রে বদ্ধ হইলেন। বাণ গুণোচিত রাজসম্মান লাভ করিয়া কিছুকাল তথায় বাস করিলেন। অনন্তর জন্মভূমি দর্শনার্থে উৎসুক হইয়া রাজার নিকট বিদায় লইয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তদীয় আত্মীয়বর্গ তাঁহার মুখে রাজা হর্ষদেবের গুণাবলী শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে ঐ রাজার জীবনচরিত লিখিতে বারংবার অনুরোধ করিলেন। তিনি সুপ্রসিদ্ধ হর্ষচরিত নামক গ্রন্থ লিখিয়া তাঁহাদিগকে শুনাইলেন।

তাঁহার সময়ে ভারতে হিন্দুধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মে ঘোরতর বিসম্বাদ চলিতেছিল। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের অহিংসা, করুণা, মৈত্রী প্রভৃতির নিরতিশয় পক্ষপাতী ছিলেন। বিকৃত-তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত জীবহিংসা, সুরাপান, ব্যভিচার প্রভৃতি দূষিত আচারের তিনি দারুণ বিদ্বেষী ছিলেন। রাজা হর্ষদেবের পিতা সাংঘাতিক

করিয়া কান্যকুব্জ অধিকার করেন, পশ্চাৎ তাহা হর্ষবর্দ্ধনদেবের হস্তগত হয়। গ্রহবর্ম্মার কেহ উত্তরাধিকারী ছিল না এবং কান্যকুব্জ অতি প্রাচীন ও সুসমৃদ্ধ। এই সকল কারণে বোধ হয় হর্ষদেব শেষে কান্যকুব্জে রাজধানী করিয়াছিলেন। রাজা হর্ষ কর্ত্তৃক শ্রীহর্ষ অব্দ প্রচলিত হইয়াছিল। এই অব্দ ৬০৭ হইতে ১১০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কান্যকুব্জে ও মথুরায় প্রচলিত ছিল।

জ্বররোগে আক্রান্ত হইলে, তদীয় রোগশান্তির উদ্দেশে রাজ্য-মধ্যে নরবলি প্রভৃতি তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত বিবিধ বীভৎস আচার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি স্বীয় হর্ষচরিত গ্রন্থে ঐ সকল পৈশাচিক কাণ্ড লক্ষ্য করিয়া এরূপ তীব্রভাবে লেখনী চালন করিয়াছিলেন, যে তাহা পড়িলে অতিবড় পাষণ্ডেরও মনে ঐ সকলের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক হয়। আবার যথায় বিন্ধ্যারণ্যে দিবাকরমিত্র নামক পরম কারুণিক বৌদ্ধযোগীর বর্ণনা, তথায় তাঁহার লেখনীমুখ হইতে অজস্র প্রেমময় নির্ঝর প্রবাহিত হইয়াছে। ফলতঃ তিনি ধর্ম্মের সারমর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তান্ত্রিক বীরাচার যে পবিত্র আর্য্যধর্ম্মের অনুমোদিত নহে, উহা যে শাস্ত্রার্থের বিকৃতি, তাহা তিনি পরিষ্কাররূপে বুঝিয়াছিলেন।

সুপ্রসিদ্ধ কাদম্বরী তাঁহার শেষগ্রন্থ। সংস্কৃত সাহিত্যে এরূপ গদ্যকাব্য আর নাই; সংস্কৃত গদ্যরচনায় তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী অদ্যাপি জন্মগ্রহণ করেন নাই। তদীয় বর্ণনার পদে পদে অতুল পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা লক্ষিত হয়। স্বভাববর্ণনায় তিনি জগতে কোন মহাকবির নিকট নিম্ন আসন পাইবার যোগ্যে নহেন। তাঁহার কাদম্বরী যে সাহিত্য-ভাণ্ডারের একটী অত্যুজ্জ্বল মহারত্ন, সে বিষয়ে কাহারও মতভেদ নাই। দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ অমূল্য গ্রন্থ সম্পূর্ণ না হইতেই তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার বংশধর পুত্র, পিতৃকীর্ত্তি খণ্ডিত থাকে দেখিয়া, উহার অবশিষ্ট ভাগ রচনা করিয়া গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ করিয়াছেন। বাণ-তনয়

গ্রন্থের ভূমিকায় অতি বিনীতভাবে বলিয়াছেন যে,—"আমার পিতার এই অপূর্ব্ব কথাপ্রসঙ্গ খণ্ডিত থাকে বলিয়াই আমি ইহার শেষভাগ রচনা করিলাম; আমি নিজের কবিত্ব দেখাইবার জন্য ইহাতে প্রবৃত্ত হই নাই।" বাণতনয় ইহাতে নিজের নাম পর্য্যন্ত প্রকাশ না করিয়া সৌজন্য ও বিনয়ের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। যদিও পিতা ও পুত্রের লেখা এককালে অভিন্ন নহে, তথাপি অনেক স্থলে কে পিতা কে পুত্র তাহা চিনিতে পারা যায় না।

ধন্য বাণতনয়! তুমি কুলপাবন পিতার কুলপাবন পুত্র জন্মিয়াছিলে!

রত্নাকর-চরিত।

নাম রত্নাকর অতি ঘোরতর ছিল দস্যু একজন;
পরস্বহরণ সদা তার পণ, নরহিংসাপরায়ণ।
বনপথে গিয়া প্রচ্ছন্ন হইয়া মুদ্গর লইয়া করে,
পথিক-গমন তথা প্রতিক্ষণ থাকিত প্রতীক্ষা ক'রে।
বৃদ্ধ বা যুবক অবলা বালক না ভাবিত একবার;
মুদ্গর হানিয়া পরাণ বধিয়া সর্ব্বস্ব হরিত তার।
পাপের মূরতি যেন সে দুর্ম্মতি যমের দোসর প্রায়;
কালে সে না জানি কত মহাপ্রাণী পরাণে মারিল হায়!
দৈবে একদিন সেই পথ দিয়া চলিলা নারদ মুনি;
মহাযোগিবর, যেন মধুময় প্রেমের মুরতি খানি।

যেন মূর্ত্তিমতী তপস্যার সিদ্ধি বীণাটী লইয়া করে,
প্রেমার্দ্র বীক্ষণে যেন ত্রিভুবনে সিঞ্চিলা অমৃতধারে।
দেখিয়া তাঁহারে আসিতে তথায় লতা অন্তরাল ছাড়ি,
আগুলিল দস্যু বধিতে—মারিয়া প্রচণ্ড দণ্ডের বাড়ি।
দিব্যতেজোময় দেবর্ষি তাহায় বধিতে উদ্যত দেখি,
'তিষ্ঠ' 'তিষ্ঠ' বলি জলদগম্ভীর বচনে কহিলা ডাকি।
সেই বাণী শুনি দস্যুর অমনি স্তম্ভিত হইল কায়;
মুনির সম্মুখে রহিল সে যেন কাষ্ঠপুত্তলির প্রায়।
অবশ অচল বিস্ময়ে বিহ্বল, রোষে স্ফীত কলেবর;
অন্তরে গরল জ্বলিছে, সে যেন মন্ত্রাহত বিষধর।

দেবর্ষি তখন কহিলা তাহারে সম্মুখে সে ভাবে হেরি;
অতি ধীর স্বরে ব্রহ্মাণ্ডবাসীর লোমহরষণ করি।
'ওরে দস্যু! ঘোর পাতকী! নারকী! নাহি তোর কোন জ্ঞান;
অতি ঘোরতর নরকেও যে রে রহিল না তোর স্থান!
আপনার তরে হর পরপ্রাণ বুঝিতে নারিলে হায়!
ঘোরতর পাপে চিরকাল তরে বিনাশিলে আপনায়।
পিতা মাতা সুত বনিতা বান্ধব কেহ তার সঙ্গী নয়,
আপনার পাপে ভীষণ নরকে যে জন মগন হয়'।

মেঘের গম্ভীর গরজনসম তাঁহার সে বাণী শুনি;
জিজ্ঞাসিল দস্যু পরম বিস্ময়ে,—'মহাশয়! কে আপনি?
কে যে আমি নাহি জানেন নিশ্চয়, কথায় বুঝিতে পাই;
দৈবে হতবল হয়েছি, জীবিত এখনো আছেন তাই।

যাহা কিছু করি, হউক সে পুণ্য, হউক সে ঘোর পাপ ;
জীবিকার তরে করি সে সকল, তাহে কিবা পরিতাপ।
কেবল নিজের উদরের তরে বহু লোক নাহি মারি ;
বৃদ্ধ মাতা পিতা দারা শিশু সুত যতনে পালন করি।
যাহাদের তরে নরহত্যা আদি করি আমি প্রতিদিন ;
আমার সহিত অবশ্য তাহারা হবে এর ফলাধীন।
যদিই নরকে গতি হয় মোর আপনার এ কথায় ;
স্বজন সহিত যাইব নরকে, কিবা পরিতাপ তায় ?

নারদের উক্তি।

একাকী জনমে জীব এ সংসারে একাকীই পায় লয় ;
সুকাজ কুকাজ সকলেরি ফল একাকী ভুগিতে হয়।
শুভ কি অশুভ যেই কোন কাজ হেথা অনুষ্ঠিত হয় ;
ফলভোগী তার কর্ত্তাই নিশ্চয়, অপরের কিছু নয়।
সহস্র জনক জননী অথবা শত শত পুত্র দার
ভূত ভবিষ্যতে হয়েছে হইবে, তুমি কার কে তোমার ?
আমি একা, আর কেহ নহে মোর, আমি কারো কেহ নই ;
আমি যার কিম্বা যে জন আমার, দেখিনা সে জন কোই।
স্ত্রীপুত্রের সুখ সাধিবারে নর পাপ আচরণ করে ;
ইহ পরকালে করে দুঃখভোগ সেই পাপাচার তরে।
অনলে ফেলিয়া পুরুষের দেহ ফিরে জ্ঞাতি বন্ধুগণ ;
নিজ কর্ম্মফল তাহার কেবল সঙ্গের সাথী তখন।

আমারি কর্ম্মের আমি বই আর ফলভোগী কেহ নয়;
পরলোক-সুখে বাসনা থাকিলে এ বিচার যেন রয়।
পাপ কর্ম্ম করি নিত্য এই ক্লেশ সহিছ যাদের লাগি;
জিজ্ঞাসিয়া জান হবে কিনা তারা ইহার ফলের ভাগী।

দস্যুর উক্তি।

-আপনার বাক্যে বিষম সংশয়ে যাতনা উদিল মনে;
গৃহে গিয়া তবে জিজ্ঞাসিয়া জানি প্রিয়তম বন্ধুগণে।
ক্ষণকাল হেথা দাঁড়ান আপনি, এখনি আসিব ফিরি;
গৃহে গিয়া সবে জিজ্ঞাসা করিয়া সংশয় ভঞ্জন করি।

এই কথা বলি, সংশয়ে কাতর সত্বর চলিল ঘরে;
পরিবারগণে ডাকিয়া আবেগে জিজ্ঞাসিল তার পরে।
"প্রতিদিন আমি জীবিকার তরে তোমাদের সবাকার,
নরহত্যা আদি যত পাপ করি, হবে নাকি ভাগী তার?
হে পিতঃ! হে মাতঃ! গৃহিণি! তনয়! বল বল সত্য কথা;
দারুণ সংশয় দহিছে হৃদয়, ঘুচাও মনের ব্যথা।
বিষম আতঙ্ক জানি না কি হেতু উপজিল আজি মনে;
শেল সম তায় না ঘুচালে হায়! বাঁচিব না বুঝি প্রাণে"।

পিতা-মাতার উক্তি।

বাল্যে পুত্র যথা পাল্য সেই মত বৃদ্ধকালে পিতা মাতা,
যার যে কর্ত্তব্য সে পালিবে তাহা সংসারের এই প্রথা।
আত্মাই কেবল আত্মার সম্বল আত্মাই আত্মার গতি;
আত্মাই ভুঞ্জিবে আত্ম-কর্ম্মফল সকলেরি এ নিয়তি।

পিতা মাতা সুত পত্নী বন্ধুজন আত্মার আশ্রয় নয়;
একাই মানব চলে পরলোকে, কর্ম্মমাত্র সাথী হয়।
আপনার কিম্বা স্বজনের লাগি যে কাজ যে জন করে;
সেই সে কাজের হয় ফলভোগী, অন্যে কি সে ধার ধারে।

ভার্য্যার উক্তি।

করিয়া যতন ভার্য্যার পালন করিবেন সদা স্বামী;
পালিবে আমারে তুমি, আর কিছু অধিক না জানি আমি।
'পরপ্রাণ হর' বলি অনুরোধ না করি কভু তোমায়;
তবে বল নাথ! তব কৃত পাপ কেন পশিবে আমায়।

পুত্রের উক্তি।

অজ্ঞান বালক নাহি জানি আমি পাপ পুণ্য কারে কয়,
এইমাত্র জানি পিতারি যতনে শিশুর পালন হয়।
শৈশবে যেমন পালিছ আমায়, বার্দ্ধক্যে তেমনি তুমি—
কার্য্যে অপারগ হইবে যখন, তোমারে পালিব আমি।

শুনি এ সকল বহুদিন পরে জন্মিল পাপীর জ্ঞান;
বুঝিয়া বিষাদে নিঃশব্দে চলিল ছাড়ি নিজ বাসস্থান।
বালার্ক জিনিয়া মধুরদর্শন মুনির উদ্দেশে গেল;
হেরি তথা তাঁরে অমনি তাঁহার চরণে পতিত হ'ল।

নারদের উক্তি।

ওরে মূঢ় দস্যু! বল কি সংবাদ, কেন হেরি দীনপ্রায়?
অথবা কথায় কাজ কিবা হায়! আকারেই জানা যায়।

রুধিরের ন্যায় গন্ধ তব গায়, আকার শবের মত ;
নররূপী তুমি সাক্ষাৎ পিশাচ, জীবন থাকিতে মৃত।
আত্মা তব মৃত, সকলি বিকৃত, সকলি পাতকময় ;
শয়নে স্বপনে কিম্বা জাগরণে সুখলেশ নাহি রয়।
মহাপাপে হায় ! অতি শোচনীয় হয়েছে তব হৃদয় ;
ঘোর দাবানলে দহিলে যেমন অরণ্যের দশা হয় !

দস্যুর উক্তি।

সত্য তব বাণী হে মহাপুরুষ ! সকলি দুষ্কৃত মোর ;
নিজ পাপরাশি এবে হৃদি আসি জ্বালিল অনল ঘোর।
যে কঠোর তাপে পুড়িছে হৃদয়, নহে তার সমতুল—
ঘোর তুষানল কিম্বা দাবানল, বাড়বাগ্নি, হলাহল।
ভয়ঙ্কর যত করেছি দুষ্কৃত, আমি রে পাতকী অতি ;
সে সব স্মরিয়া শীহরিছে হিয়া, কি হবে আমার গতি !
হ'য়ে দীনহীন চেতনাবিহীন দহ্যমান নিশিদিনে ;
সমগ্র ধরণী ঘুরিয়াও শান্তি নাহি পাব কোন খানে।
মহাপাতকীর নাহি কি গো স্থান, হরি ! হরি ! মরি ! মরি !
কার কাছে যাব, কোথায় জুড়াব, বলুন করুণা করি।
স্মরি সে সকল অতি ঘোরতর আপন দুষ্কৃত যত,
খসিয়া পড়িছে দেহের বন্ধন, বিদীর্ণ হতেছে চিত।
বিকল বিহ্বল অন্তরাত্মা মোর ডুবিছে আঁধারে ঘোর ;
থাকিতে পারি না, কেন যে চেতনা ঘুরিয়া যাইছে মোর।

হায়! কি যাতনা কি তীব্র বেদনা পাপ কর্ম্ম হ'তে হয়;
প্রচণ্ড দহনে দহিছে আমায় কিসে বাঁচি মহাশয়!
আপনারি পাপে জ্বলিয়া আপনি লইনু তব শরণ;
হে দয়ানিধান! দেহ মোরে জ্ঞান সর্ব্ব-পাপ-বিনাশন।

পাপতাপে পাপী হইয়া বিকল কাঁদিল অনাথমত;
নিরখি তাহায় গলিল দয়ায় মুনির কোমল চিত।
শিবশক্তিময় রাগ মনোহর পরমপ্রেমসাগর,
স্মরিলেন তিনি, শুনিয়া যে রাগ দ্রব হন বিশ্বম্ভর।
যোগে আঁখি স্থির, মূরতি গভীর শোভিলেন মুনি তায়;
প্রশান্ত গভীর নির্বাত সুধীর বিশাল জলধি প্রায়।
বীণাযন্ত্রে মুনি মূর্চ্ছিত করিয়া যেন বিশ্ব চরাচর;
তারকব্রহ্মের সঙ্গীত-লহরী তুলিলেন তার পর।
অপার্থিব সেই সঙ্গীত মিশিল তন্ত্রীর ঝঙ্কার সনে;
প্লাবিত হইল দশ দিক্ যেন অমৃতের প্রস্রবণে।
দেবর্ষির সেই সংগীতের তানে স্থাবর জঙ্গম বিশ্ব
নিস্পন্দ স্তিমিত যেন চিত্রার্পিত হইল অপূর্ব্ব দৃশ্য!
থামিল সহসা মহাসিন্ধুনাদ, না চলিল তরঙ্গিণী;
না বহিল বায়ু, না নড়িল কেহ, পশু পক্ষী কীট প্রাণী।
গলিল পাষাণ, প্রখর তপন শীতল হইয়া গেল;
বজ্রেরো অমনি হৃদয় তখনি শতধা বিদীর্ণ হ'ল।
দিব্য কুসুমের গন্ধে দশ দিক্ আমোদিত হ'ল কিবা;
সুধাকর-করে স্নান করি যেন ধরিল পরম শোভা।

গাইয়া এরূপে মহাযোগী সেই ত্রৈলোক্যমোহন গান ;
কহিলেন,—'মূঢ়! দেখ্ রে করিনু দিব্য চক্ষু তোরে দান।
দেখ্ প্রেমময় এ বিশ্ব সংসার, দেখ্ বিভু প্রেমময় ;
দেখ্ ভুক্তি মুক্তি বিশ্বপ্রেমে সব প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে রয়।
বিশ্বপ্রেম তবে আরাধিয়া তবে তোষহ বিশ্বের পতি ;
সর্ব্বপাপ হ'তে বিমুক্ত হইবে লভিবে অমৃত গতি।
মৃতসঞ্জীবনী এই যে রে বীণা দেখিছ আমার করে ;
অমৃতাখ্য (১) এই, পাইবে ইহারে তপে সিদ্ধ হ'লে পরে।
হ'বে আদি কবি বাল্মীকি নামেতে পূজিত জগতজনে ;
মোহিবে সংসার সুরাসুর-নর শ্রীরামচরিত-গানে'।

বিস্ময়-স্তিমিত নয়নে সে দস্যু দেখিতে দেখিতে তাঁয় ;
সে দিব্য মূরতি কোথা গেল চলি আর নাহি দেখা যায়।

সমাপ্ত।

(১) 'অমৃতাখ্য'—যে বীণার আখ্যা অর্থাৎ নাম 'অমৃত'।